- - - - - - নাসদীয়সূক্তম্ - - - - - -

Talk delivered by Swami Samarpanananda at Ramakrishna Vivekananda University before the students of Indian Spiritual Heritage Course –

(Transcribed and edited by Amit Ray Chaudhuri)

আমরা এখন নাসদীয়সূক্তম্ সম্বন্ধে আলোচনা করব। নাসাদীয়সূক্তম্ আর পুরুষসূক্তম্‌কে যদি একবার ঠিক ঠিক ভাবে বুঝে নেওয়া যায় তাহলে ভারতের প্রাচীন দার্শনিকরা সৃষ্টির রহস্যকে কিভাব দেখতেন, সৃষ্টি তত্ত্বের আড়ালে কোন্ কোন্ দর্শনের কি কি ভূমিকা কাজ করছে, আর সেই দর্শনকে ভিত্তি করে পরবর্তি কালে আমাদের দেশে কিভাবে অন্যান্য দর্শনের জন্ম নিয়েছে, আমাদের ঋষিরা চিন্তার রাজ্যে কত উচ্চ স্তরে বিচরণ করতেন, এই জিনিষগুলি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে আমাদের পক্ষে নাসাদীয়সূক্তম্ পুরোপুরি বুঝে নেওয়া খুবই কঠিণ হবে, তবে যতটা বোঝা যায় আর একটু ধারণা থাকলে হিন্দু ধর্মের মূল ব্যাপারটা পরে বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হবে না।

আদিম যুগ থেকে সৃষ্টির রহস্য সমস্ত চিন্তাবিদ মানুষকে আকৃষ্ট করে আসছে। আমি কোথা থেকে এলাম, আমার জন্ম কেন ও কিভাবে হল, এই জগৎ কোত্থেকে এসেছে, যখন থেকে মানুষের মধ্যে চিন্তা শক্তির উন্মেষ হয়েছে তখন থেকে এই ব্যাপার গুলো মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যখন কেউ জ্ঞানের অনেক উচ্চস্তরে চলে যান সে দর্শনের ক্ষেত্রেই হোক বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক সৃষ্টির ব্যাপারে তাকে ব্যাখ্যা করতেই হবে। কিছু দিন আগে আমেরিকার এক বিজ্ঞানী অনেক গবেষণা করে বললেন আমরা সবাই অন্য গ্রহ থেকে এসেছি। তিনি বলছেন পৃথিবীতে যেসব জড় পদার্থ রয়েছে তার থেকে কখনই প্রাণের উদ্ভব হতে পারেনা। পৃথিবীতে প্রাণীরা এসেছে অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র থেকে।

মূল কথা তুমি কে, আমি কে, আমরা কোথা থেকে এলাম, তুমি বিজ্ঞানী হও, তুমি দার্শনিক হও আর তুমি ধর্মের নেতা হও, এই প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে। সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে আর সৃষ্টিটা কি এই প্রসঙ্গ ঠাকুর অবশ্য কখনই তোলেননি। স্বামীজী যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন তাঁর খুব ইচ্ছে হয়েছিল, বেদ থেকে শুরু করে পুরানাদিতে সৃষ্টি নিয়ে যত ধরণের আলোচনা হয়েছে, সৃষ্টির ব্যাপারে যত রহস্য আছে সবটাকে মিলিয়ে একটা সাধারণ মতের উপরে দাঁড় করাবেন।

সাধারণ ভাবে আমরা চোখের সামনে যে সৃষ্টি সমূহকে দেখছি সেই সৃষ্টি পরিষ্কার দুই রকমের হয়। শ্রীমা বলছেন – ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি চিত্রকরের মত করেন না। শ্রীমায়ের কথাতে বোঝা যাচ্ছে যে ঈশ্বরের সৃষ্টি রচনা আর চিত্রকরের সৃষ্টি রচনার মধ্যে একটা প্রভেদ রয়েছে। যদি একটা ছোট্ট বটবৃক্ষের বীজ মাটিতে রোপণ করা হয় তাহলে আমরা জানব যে ঐ বীজ থেকে একটা বট গাছ বেড়োবে, কিন্তু বীজ থেকে বেড়িয়েই বট গাছ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়ে যাবে না। আগে তার দুটো পাতা বেরোবে তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে বড় হতে থাকবে, একটা দীর্ঘ সময় ধরে এই বেড়ে ওঠাটা চলতে থাকবে। আমরা নিশ্চিত ভাবে বলে দিতে পারি যে কোন বীজ থেকে এভাবেই একটা উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে, আবার একটা বীজের মধ্যে সমগ্র বৃক্ষটা সুপ্ত হয়ে রয়েছে। এই বীজ মাটি থেকে রস পেয়ে অঙ্কুর বার করবে, তারপরে আলো বাতাস জল পেয়ে আস্তে আস্তে সে বড় হত থাকবে, তার ফল কবে হবে আদৌ হবে কিনা সেটা আমরা বলতে পারছি না, কিন্তু গাছটা এই ভাবেই বড় হতে থাকবে। শ্রীমা যেটা বলতে চাইছেন তা হল ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি এইভাবেই করেন। কিন্তু চিত্রকর যখন কোন মানুষের ছবি আঁকেন তখন সে ইচ্ছে করলে আগে মাথাটা আঁকতে পারেন তারপর হয়তো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঁকলেন, এখন সে ইচ্ছে করলে আগে হাত পা এঁকে নিয়ে পরে মুণ্ডুটা

আঁকলেন। কিন্তু যখন বীজ থেকে গাছ হচ্ছে তখন গাছের ডালপালা বেরোবার আগেই ফুল বা ফল হবে না। চিত্রকর ইচ্ছে করলে গাছের ফুলটা আগেই এঁকে দিতে পারেন। চিত্রকরের অঙ্কন দেখে কেউ ধরতে পারবে না যে সে কোনটা আগে কোনটা পরে এঁকেছেন।

এই কারণে এই দুই ধরণের সৃষ্টির দুটো নাম দেওয়া হয়েছে – ডারউইনের যে বিবর্তনবাদ এসেছে এরই একটা নাম থেকে, এখানে একটা থেকে আরেকটা পর পর এগিয়ে চলে। একটা নির্দিষ্ট নিয়মে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি এগোবেই, কেউ এর এগোনকে আটকাতে চাইলেও আটকাতে পারবে না। দ্বিতীয় প্রকারের সৃষ্টি হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। ভগবান ইচ্ছে করলেন মানুষ হোক, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি হয়ে গেল, এইভাবে ঘোড়া হোক, ঘোড়া হয়ে গেল, হাতি হোক, হাতি হয়ে গেল। এই দুই ধরণের সৃষ্টির মধ্যে কোন মিল পাওয়া যাবে না। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি হচ্ছে চিত্রকরের মত রচনা আর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি এগিয়ে চলে। শ্রীমা এইটাই বলছেন ভগবানের সৃষ্টি বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই হয়, পুরো জিনিষটাই অন্তর্নিহিত আছে সেটা আস্তে আস্তে খুলতে থাকে। খুলে কোথায় যাচ্ছে আমরা বলতে পারবো না, আর এ ব্যাপারে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু যখন খ্রীশ্চান বা ইসলাম ধর্মে যাব সেখানে দেখতে পাব যে সেখানে সৃষ্টিটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হচ্ছে। ভগবান প্রথমে আদমকে মানুষ রূপে সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে আদমকে বললেন এবার আমাকে ইভের সৃষ্টি করতে হবে, তোমার বুকের পাঁজরের হাড় থেকে ইভের সৃষ্টি হবে। নারীর সৃষ্টি কোথা থেকে এলো? খ্রীস্টানদের মতে পুরুষের বুকের পাঁজরের হাড় থেকে। তার মানে ভগবান যদি চাইতেন আমি আগে নারীর সৃষ্টি করব, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি তা করতে পারতেন। কিন্তু বিবর্তনবাদে কখনই এই ভাবে সৃষ্টি হয় না।

এখন কোন্ পদ্ধতিটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় এটা ঠিক করা আমাদের এই বুদ্ধি দিয়ে সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতীয় পরম্পরাতে বিবর্তনবাদকে সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে মনে করে আসছে। শুধু তাই নয়, এর সাথে হিন্দুরা আরো বলেন, ভগবান কি রকম সৃষ্টি করেন – পূর্বমকল্পন্ অয়ম্, এর আগের আগের কল্পে সৃষ্টি যে রকমটি ছিল, এই কল্পেও ঠিক সে আগের মতই সৃষ্টি করেন। এর আগের আগে কল্পে গাঁদা গাছ যেভাবে বড় হয়েছিল, এই কল্পেও ঠিক সেইভাবেই গাঁদা গাছ বড় হবে। হিন্দুদের বেশির ভাগ শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ স্বাভাবিক ভাবে বিবর্তনবাদকেই মেনে এসেছে, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ভারতে এই বিবর্তনবাদ বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। অন্য দিকে পাশ্চাত্য দর্শন এই বিবর্তনবাদকে জানতই না, কারণ তারা তাদের ধর্মীয় কারণে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিতেই বিশ্বাস ছিল, তাই তারা বিবর্তনবাদকে নিতে পারল না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ভগবান যখন কোন এক সময়ে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য ছিল। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে তাঁর কি উদ্দেশ্য জানতে পারা যায় না। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছানর জন্য বিবর্তনের তত্ত্ব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মানতে হবে। অথচ হিন্দুদের মতে একটা সময় বলতে হয় যে ভগবান বিশেষ কোন একটা সময়ে সৃষ্টি করেন না, তাঁর কোন উদ্দেশ্যই নেই এই সৃষ্টির ব্যাপারে।

নাসাদীয়সূক্তম্ স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। কেন স্বামীজীর প্রিয় ছিল সেটা আমরা আলোচনা করতে করতে বুঝতে পারব।

যারা বেদ, পুরান, তন্ত্র, স্মৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র ঠিক ঠিক ভাবে পড়েছেন তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় সৃষ্টি কিভাবে হল, তারা যদি সত্যিই নিজের মন থেকে উত্তর দিতে চান তাহলে তারাও সৃষ্টির ব্যাপারে হাত তুলে দেবেন। আমি জানিনা, এটাই হচ্ছে তার সঠিক উত্তর। এটা তার কিংবা আমাদের মনের কথা নয়, শাস্ত্রও বলতে চাইছে যে আমরা বলতে পারবো না সৃষ্টি কিভাবে হচ্ছে। যিনি অনন্ত তিনি সান্ত কি করে হচ্ছেন, যিনি অখণ্ড তিনিই আবার খণ্ড হচ্ছেন, এটা কি করে হয় আমরা কেউই জানিনা। যার জন্ম সবার প্রথমে হয়েছে তিনিই হচ্ছেন জেষ্ঠ্য, তিনি যাকে জন্ম দেন সে হয়ে যায় কনিষ্ঠ, তার থেকে যে জন্ম নিচ্ছে

সে আরও কনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। ছেলে কখন বাবার জন্মের কথা বলতে পারবে না। বাবা ছেলের জন্ম দেখেছে তাই বাবা ছেলের জন্মের কথা বলতে পারে। তাই যে কোন ঋষি কি করে বলবেন সৃষ্টিটা কি করে হয়েছে। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে সৃষ্টির রহস্যকে জানার যে প্রচণ্ড স্পৃহা সেটা চিরন্তন, আদিম কাল থেকে মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্ন করে আসছে। সৃষ্টির এই অনুসন্ধিৎসুতার ক্ষুধাকে মেটাবার জন্য ঋষিরা সৃষ্টির ব্যাপারে কিছু উত্তর দেন। যখন তাঁরা উত্তর দেন তখন ওনারা দুটো দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উত্তর দেন। একটা হছে যুক্তি বিচার দিয়ে উত্তর দেন আরেকটা উত্তর দেন পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝখানে বেশ কিছু উপাধি আরোপিত করা হয়। যেমন বলা হচ্ছে – ভগবান নারায়ণ ক্ষীরসাগরে শেষনাগের উপরে অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন। শায়িত অবস্থায় তিনি চিন্তা করছেন, এক সময় তাঁর নাভি থেকে একটা পদ্ম প্রস্ফুটিত হল। সেই নাভি পদ্মের উপরে প্রথম জাত হলেন ব্রহ্মা। এই কাহিনীর মধ্যে যে শব্দগুলি বলা হয়েছে তার একেকটা শব্দের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। নারায়ণ মানে নরে যাঁর অয়ন, মানে যিনি জলে বাস করেন, এখানে জল হচ্ছে ক্ষীরসাগর। আবার নর হচ্ছে মানুষ, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যাঁর বাস তিনিই নারায়ণ, এই দুটো অর্থই হয়। আবার তিনি সাপের উপরে শুয়ে আছেন, সাপের নাম হচ্ছে অশেষ নাগ। অশেষের অর্থ হচ্ছে অনন্ত, তিনি অনন্তের প্রভু। এগুলো সবই হচ্ছে উপাধি। শব্দ দিয়ে তাঁর একটা রূপ দেওয়া হচ্ছে, যখন এই রূপ দিয়ে দিল তখন সেই রূপের মাধ্যমে একটা আখ্যায়িকা তৈরী হয়ে গেল। সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার এটাও একটা পথ। যখন গীতাতে ভগবান বলছেন *'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্'* সব জায়গায় তাঁর মস্তক, সর্বত্র তাঁর চোখ, সব জায়গাতেই তাঁর হাত, পা ইত্যাদি, এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করার একটা পথ। যখন বলছেন তিনি সব জায়গাতেই আছেন আসলে বলতে চাইছেন তিনি একটা জায়গার মধ্যে আবদ্ধ নন। আমি যখন ঘরে নিজের চেয়ারে বসে থাকি তখন আমার সত্তা ঐটুকু ঘরের মধ্যেই শেষ। ভগবানও কি এই রকম শুধু বৈকুণ্ঠে বসে আছেন? অতি সাধারণ মনের অধিকারী মানুষ এই জিনিষটাকে বুঝতে চায়না যে ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তখন এই ধরণের মনকে কিছু একটা ধারণা করাবার জন্য বলা হল ভগবান তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে বৈকুণ্ঠে বসে আছেন, আর তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত জগত চলেছে। আবার যাদের মন এর থেকে আরেকটু উঁচুতে উঠেছে তাদের জন্য বলা হবে ভগবানের হাত সর্বত্র, সর্বত্র তাঁর পা, সর্বব্যাপী তাঁর চোখ। এদের থেকেও যাদের মন আরো উন্নত তাদেরকে বলা হবে তিনি হচ্ছেন নির্গুণ নিরাকার। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন – প্রথমে মা কালীর সহস্র হাত দেখে, তারপরে দেখে দশটি হাত, তারপরে চারটে, পরে চারটে থেকে দুটো শেষে দেখে কিছুই নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল রঙের দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে জল নিয়ে দেখে জলের কোন রঙ নেই। যে মানুষের মন ঈশ্বর থেকে যত দূরে সেই মানুষের জন্য তত বেশি পৌরাণিক কাহিনীর উপস্থাপনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের যত কাছে যাওয়া যাবে ততই নির্গুণ নিরাকারের দিকে মন চলে যাবে। এইভাবেই বিভিন্ন মানসিক স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্মের তত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন ভাবে শাস্ত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ভারতের তথা বিশ্বের প্রথম দর্শন হচ্ছে সাংখ্য দর্শন, সাংখ্য দর্শনকে তাই সব দর্শনের জনক বলা হয়। সাংখ্য থেকেই জন্ম নিল যোগদর্শন, তারপর এল ন্যায়, বৈশাষিক, কর্মকাণ্ড বা পূর্বমীমাংসা আর উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। এই ছয়টি দর্শনের সব বীজ বেদে আগে থাকতেই আছে, বেদের বাইরে এরা নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করেননি। সেই কোন মান্ধাতা আমল থেকে চলছে, তাই নতুন কেউ কিছু বলছে না। সাংখ্য সৃষ্টির যে তত্ত্বটাকে স্বীকার করে সেটি সব থেকে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হবে। পুরান যে সৃষ্টি তত্ত্বকে গ্রহণ করেছে সেটা পুরোটাই হচ্ছে পৌরাণিক। পরের দিকে বেদান্ত দুটো দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করল। বেদান্তের যাঁরা জ্ঞানমার্গী, বিশেষ করে শঙ্করাচার্য, স্বামীজী এনারা সাংখ্যের তত্ত্বটাকে গ্রহণ করেছেন। বেদান্তের আরেকটা মার্গ হচ্ছে ভক্তিমার্গী এনারা পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীটাকেই বেশি প্রাধাণ্য দিয়ে সেটাকেই আঁকড়ে থাকলেন। সাংখ্যের তত্ত্বকে যে যুক্তিযুক্ত বলে মানা হয় তাতে কিন্তু মনে করা উচিৎ নয় যে এর

একেবারে সবটাই যুক্তিযুক্ত, কেননা একটা জায়গাতে এসে বেশি চাপ দিলে সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বেও ফাটল ধরতে শুর করবে।

অন্য দিকে পদার্থ বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই বলেন, কখন বলছেন বিগব্যাঙ, কখন বলছেন ব্ল্যাকহোল, কিন্তু তাঁরাও বলেন যে একটা জায়গায় গিয়ে তাঁদের এই সব থিয়োরিও কোন কাজ করেনা। সাংখ্য দর্শনেও এই একই জিনিষ হয়, একটা জায়গার পর আর প্রশ্ন করা যায় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গি এই জিনিষটাই করতে গিয়েছিলেন। এই সৃষ্টির ব্যাপারে যাজ্ঞবল্ক্যকে গার্গি একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছেন। একটা জায়গায় গিয়ে গার্গি যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করে তত্ত্বটাকে আরো টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল, তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন – গার্গি খুব সাবধাণ, না বুঝে যদি এই প্রশ্ন কর তাহলে তোমার মাথা ধর থেকে খসে যাবে। গার্গি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন যখন করা হয় তখন একটা জায়গার পর আর প্রশ্ন করতে নেই। অবশ্য তারও আগে প্রশ্ন করার পাত্রতা থাকা চাই, আমি এই প্রশ্ন করার যোগ্য কিনা জেনে নেওয়া দরকার। কথামৃতে ঠাকুরকে এসে অনেকেই প্রশ্ন করছে ঠাকুর কাউকে উত্তর দিচ্ছেন আবার কাউকে পাশ কাটিয়ে দিচ্ছেন। একজন এসে বলছে 'ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে কেউ এসে দেখিয়ে দিক', ঠাকুর বলছেন 'তার ভারি বয়ে গেছে তোমাকে দেখাতে'। এদের প্রশ্ন করার পাত্রতাই হয়নি, প্রশ্নের উত্তর যদি দেওয়াও হয় তাহলেও কিছু বুঝবে না, উল্টো বুঝে আরেক বিপত্তি হবে। যাদের সাধনা করে মনের শুদ্ধতা এখনও অর্জিত হয়নি তাদেরকে এসব কথা বলা হলেও কিছুই বুঝবে না।

যুক্তি বিচারের দ্বারা সৃষ্টির যে কথা বলা হচ্ছে আর পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যে সৃষ্টির কথা বলা হয় এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গীই কিন্তু প্রথম থেকেই বেদে বলা হয়ে গেছে। সৃষ্টির ব্যাপারে যে পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বেদে সেটা পুরুষসূক্তমে পাচ্ছি। পুরুষসূক্তম্ পুরোটাই পৌরানিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যিনি পুরুষ, পুরুষ মানে সেই ভগবান, সেই পুরুষকে গিয়ে দেবতারা বললেন আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে। সেই পুরুষকেই দেবতারা যজ্ঞের পশু বানাল। সেই পশুকে যখন যজ্ঞে বলি দিচ্ছে তখন সেই যজ্ঞ থেকে পুরুষের একেকটি অঙ্গ থেকে বিভিন্ন সৃষ্টি হতে থাকল। এইটাই হচ্ছে পুরানের দৃষ্টিভঙ্গী। আবার যুক্তি বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে নাসদীয়সূক্তে। তাই নাসাদীয়সূক্তম্ আর পুরুষসূক্তে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ রূপে আলাদা। নাসাদীয়সূক্তম্ হচ্ছে দার্শনিক তত্ত্বের আধারে আর পুরুষসূক্তম্ পৌরাণিক আধারে। পুরুষসূক্তমের সবটাই কবিতার আকারে বর্ণনা, যার মধ্যে সত্যের উপাদান অনেক কম পাওয়া যায়। একটা দুটো বাস্তব সত্যের উপাদান নিয়ে বাকিটা কাব্যিক ঢঙে সাজান হয়েছে। এখন যদি আমরা সত্যি সত্যি ধরে নিই যে ভগবানকে ধরে নিয়ে এসে বলি দিয়ে যজ্ঞে তাঁকে আহুতি দিচ্ছে তাহলে কিন্তু এর তাৎপর্য আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। পুরুষসূক্তমের তাৎপর্য হচ্ছে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব ঈশ্বরের থেকেই বেরিয়েছে, ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই। এই তত্ত্বটাকে বলার জন্য এত বড় একটা রূপকাকারে ছবি আঁকা হয়েছে। কেন এটা করেছেন? আমাদের মত মুর্খদের জন্য। হাজার খানেক স্বর্গ আর লাখ খানেক নরক যদি না থাকে, ভয় যদি আমার নাইই থাকে তাহলে আমরা কিসের জন্য ধর্ম পালন করব। ঋষিরা দেখলেন এদের তো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দিলে নিতে পারবে না, আর পাপের ভয় যদি না থাকে তাহলে কেউ আর ভালো কাজের দিকে এগোবেই না। তাই আমাদের মত মূর্খদের জন্য ঋষিরা বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে সামনে নিয়ে এলেন। কিন্তু তাই বলে কি ধর্মটা মুর্খদের জন্যই করা হয়েছে, কখনই তা নয়, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তিমূলক ধর্মের ব্যবস্থা এই জন্যই করা হয়েছে। ধর্ম যারা গৃহস্থ তাদের জন্যও আবার যিনি সন্ন্যাসী তাদের জন্যও, যারা স্থুল বুদ্ধি সম্পন্ন আবার যারা সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন উভয়ের জন্যই ধর্ম।

যারা সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের জন্য নাসাদীয়সূক্তম্ এবং স্থুল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য পুরুষসূক্তম্। এইজন্য দেখা যায় সারা দেশে কেউই নাসাদীয়সূক্তম্ আবৃত্তি করে না, কিন্তু পুরুষসূক্তম্ সবাই পাঠ করছে। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের যখন শরীর চলে যায় তখন তাঁর দেহকে যখন স্নান করান হয় তখন

পুরুষসূক্তম্ থেকে পাঠ করা হয়। নাসাদীয়সূক্তম্ বেশির ভাগ মানুষই বুঝতে পারেন না, কারণ এর মন্ত্র গুলি অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ। এর অর্থগুলি এত জটিল আর এত অর্থ হতে পারে যার ফলে যত পণ্ডিত এর অনুবাদ করেছেন কারুর সঙ্গে কারুরটা মেলে না। স্বামীজীও নাসদীয়সূক্তমের অনুবাদ করেছেন। নাসদীয়সূক্তমের মধ্যে এত গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রয়েছে, তার ফলে যে কোন পণ্ডিত ইচ্ছে করলে শব্দের অর্থটা একটু এদিক ওদিক করে দিয়ে যে কোন একটা পৃথক দর্শনকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। শব্দের অর্থটা নিজের ইচ্ছে মত পাল্টানোর কথা বলা হচ্ছে না, সংস্কৃতের একটা অর্থের পাঁচ রকম অর্থ হতে পারে, এখন এই পাঁচটা অর্থকে পাঁচ ভাবে নিলে পাঁচটা আলাদা আলাদা দর্শন দাঁড়িয়ে যাবে।

স্বামীজী নিজেও সায়ানাচার্য শব্দগুলির যে অর্থ করেছেন তার থেকে সরে এসে অন্য অর্থ করেছেন। কেননা স্বামীজী মনে করেছেন নাসদীয়সূক্তমের ঠিক ঠিক ব্যখ্যা দিতে গেলে এই শব্দের এই অর্থটাকেই নিতে হবে, সৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে হলে এই অর্থকেই গ্রহণ করতে হবে। যার জন্য স্বামীজী ইংরাজী অনুবাদ করার সময় নিজের মত অর্থ করেছেন। স্বামীজী তাঁর নিজস্ব যে ভাব নিয়ে ইংরাজী অনুবাদ করেছেন, এটাকেই যখন বাংলাতে অনুবাদ করা হয়েছে তখন তাঁর সেই ভাবটা সেখানে না থাকাতে পুরো অনুবাদটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। যেমন গীতাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অনাসক্ত ভাবে কর্মের কথা বলেছেন, এখন এই অনাসক্তের ইংরাজী অনুবাদ হচ্ছে detached or unattached কিন্তু স্বামীজী এর অনুবাদ করলেন unselfish, unselfishness work, কিন্তু অনাসক্তের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। অথচ যখন গভীর ভাবে এর গূঢ়ার্থকে ভাবা হয় তখন দেখা যায় যে স্বামীজীর অনুবাদটাই সব দিক থেকে উপযুক্ত হয়েছে। আবার যখন এই unselfishness work কে বাংলায় অনুবাদ করে দিল তখন করল নিঃস্বার্থ কর্ম। এরপর যখন গীতা অধ্যয়ণ করব তখন এইটাই পড়ব অনাসক্ত হও আর এইটারই স্বামীজীর অনুবাদ যখন পড়ব তখন পড়ব নিঃস্বার্থ হও। কিন্তু অনাসক্ত আর নিঃস্বার্থের মধ্যে কোন মিল নেই। কারণ স্বামীজী শুধু অনুবাদই করেননি তার সাথে সাথে তিনি এর একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছেন। মানুষ অনাসক্তের কি বুঝতে পারবে, আমি অনাসক্ত হয়ে কিভাবে রান্না করব? তাই বলছেন তুমি নিঃস্বার্থ হয়ে রান্না কর। রান্না যখন করছ তখন তোমার জন্য যখন করছ তখন আরও দুজনের জন্য কর। মা যখন রান্না করে তখন তার নিজের জন্যই শুধু করে না, সবার জন্যই করে – এইটাই হচ্ছে প্রকৃত অনাসক্ত। প্রত্যেক মায়েরাই এইভাবে রান্না করেন, অনাসক্ত হয়ে করছেন, এইজন্য যে কোন সমাজে মায়েদের স্থান এত ঊর্দ্ধে দেওয়া হয়। অনাসক্ত হওয়া এই নয় যে কোন দিকে নজর দেবনা, কারুর খোঁজ খবর নেব না, সেইজন্য মানুষকে বলা হচ্ছে তুমি নিঃস্বার্থপর হও।

কিন্তু আজকের দিনে বেশির ভাগ মানুষ পুরোপুরি স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। পরিবার সৃষ্টি হয়েছিল সবাই পরস্পর মিলে মিশে সবার সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে থাকার জন্য। পরিবার জীবনের মধ্যেই গড়ে ওঠে নিঃস্বার্থপরতা। কিন্তু এই নিঃস্বার্থপরতার ভাব থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে এসে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ার জন্য পরিবারগুলি ছোট ছোট হয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রে পরিণত হয়ে একটা অন্ধকারময় আত্মসর্বস্ব জীবনকে বেছে নিচ্ছে। আজকের দিনে গীতা তাই এত প্রাসঙ্গিক, কেননা এই স্বার্থপরতার অন্ধকারময় জীবন থেকে বাঁচার জন্যই প্রথমে তোমাকে নিঃস্বার্থ হতে হবে। এইটাই স্বামীজী তাঁর অনুবাদে বলতে চেয়েছেন। অনাসক্ত কর্মের কথা গীতাতে যা বলা হয়েছে আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই বলা হচ্ছে যে তোমাকে কর্ম করতেই হবে, কর্ম ছাড়া এই দুনিয়াতে কেউ বাঁচতে পারবে না, তাই আগে তুমি নিজের স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ কর, তারপর যে কাজই করবে সেটা অপরের জন্য কর, তাতে তুমিও বাঁচবে অপরকেও বাঁচার সুযোগ করে দিতে পারবে। আর তা নাহলে দলাদলি, হানাহানি, ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি চলতেই থাকবে। অনাসক্তের যে অনুবাদ স্বামীজী নিঃস্বার্থ করেছেন এটাই হচ্ছে উপযুক্ত অনুবাদ কিন্তু যে মুহূর্তে অনাসক্তের অর্থ নিঃস্বার্থ করে দেবে তখনই মনে হবে এই অনুবাদটা ঠিক হচ্ছে না। যেখানেই শাস্ত্রের কিছু শব্দকে স্বামীজী ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন তারপরে সেটাকেই যখন আবার বাংলাতে অনুবাদ করা হয়েছে তখন তার অর্থটা পুরো পাল্টে গেছে।

নাসদীয়সূক্তমের প্রথম মন্ত্র হচ্ছে - *নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।। (১)* এর প্রথম শব্দ হচ্ছে 'নাসদ্', বেদের সূক্তে যেটা প্রথম শব্দ থাকে সেই শব্দটাকে দিয়েই সূক্তের নামকরণ করে দেওয়া হয়, ন অসদ্ দিয়ে শুরু হচ্ছে বলে এই সূক্তের নাম করা হল নাসাদীয়সূক্তম্। এখানে দুটি শব্দ আছে অসৎ আর সৎ, তখন অসৎও ছিল না সৎও ছিল না। কখনকার কথা বলা হচ্ছে? 'তদানীং' মানে তখন, সেই সময়।

অসৎ আর সৎ এই দুটো শব্দ হিন্দু ধর্মের যত শাস্ত্র আছে বিশেষ করে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরানে বারে বারে আসবে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে একটা শ্লোক আছে যেখানে এই সৎ ও অসৎ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে – *অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে(১৩/১৩)*। এই দুটো শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এমনকি দ্ব্যর্থবোধাত্মক অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থের বিভিন্নতার কারণেই বিভিন্ন দর্শনের জন্ম হয়েছে। সাধারণ ভাবে আমরা সৎ এর অর্থ করি যেটা আছে। কিন্তু একটা জিনিষ আছে কিসের ভিত্তিতে বলছি যে এটা আছে। আমরা যে বলছি – আমি আছি, আপনি আছেন, সে আছে, এই বাড়িটা আছে, গাছ আছে। এই যে আছে, তার প্রমাণ কি। একটা জিনিষ আছে কি নেই বিশ্বের যে কোন দর্শনের, আজকে যে দর্শন আছে, আগেকার যে দর্শন, সবার কাছেই এইটা একটা বিরাট সমস্যা। এটাকে বলে epistemology বা Theory of knowledge। আগে তোমাকে বলতে হবে যে জিনিষটাকে তুমি জানো বলছ, সেটাকে জানার উপায়টা কি। শুনলে মনে হবে কি সব অদ্ভূত কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপার গুলো যতক্ষণ না বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ শাস্ত্রের অর্থ বোঝাই যাবে না। এইগুলিকে অবহেলা করে করে আজ হিন্দুরা নিজেদের ধর্মকেই ভুলে গেছে। মুসলমানরা তাদের ধর্মকে খুব ভালো করে জানে, কেননা ইসলাম ধর্ম খুব পরিষ্কার আর সহজ – আল্লা আছেন, তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আমাদের কাজের সুযোগ দিয়েছেন, ভালো কাজ করলে স্বর্গে, খারাপ কাজ করলে নরকে যেতে হবে। কিন্তু হিন্দুদের কাছে তাদের হিন্দু ধর্মের কিছুই পরিষ্কার নয়।

আজকের দিনে যে কোন ধর্মকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে Theory of knowledge কে জানতেই হবে, আমার হাতে একটা চক রয়েছে, আমি জানব কি করে যে এটা একটি চক। আমি যে চক দেখছি অন্যেরাও যে এই একই চক দেখছে এর প্রমাণটা কি। এটাকে না বুঝলে একটা অবস্থাতে গিয়ে শাস্ত্র আসলে ঠিক কি বলতে চাইছে সেইটিকে সঠিক ভাবে বোঝার ক্ষেত্রে একটা বিরাট সমস্যা তৈরী হবে। শাস্ত্রের অর্থকে বিচার করার ক্ষেত্রে একটা অবস্থার পর আবার নৈয়ায়িকরা চলে আসেন, তখন আবার এর চুলচেরা তর্ক আর বিচার চলতে থাকে। তখন আবার তারা ধর্মের পথ থেকে সরে আসে। বেদান্ত, উপনিষদ যারা বুঝতে চাইছেন তাঁদেরকে এই Theory of knowledge কে যুক্তি সহকারে বুঝতে হবে, যদি না বোঝেন তাহলে শঙ্করাচার্যকে বুঝতেই পারবেন না, শঙ্করাচার্যকে যদি না বোঝেন তাহলে গীতা উপনিষদ কোন দিনই বুঝতে পারবেন না।

প্রথম যে প্রমাণ আমরা পাচ্ছি তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রথম শর্ত হচ্ছে আমি যা দেখছি অপরেও যেন তাই দেখে যেটা আমি দেখছি। আমি এক রকম দেখছি আরেকজন অন্য রকম দেখছে তা কখনই হবে না। আবার কিছু জিনিষ আছে আমরা চোখে দেখছি না, যেমন ইলেক্ট্রনকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখতে পায়নি, কিন্তু গবেষণার সাহায্যে পরীক্ষা করে তার যে অস্তিত্বকে জানা গেছে এটাও প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে পড়ে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর আসছে অনুমান প্রমাণ। অনুমান প্রমাণ হচ্ছে, যেমন ধরুন খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, আমি বাড়ি ফিরলাম কিন্তু খুব ঘেমে গেছি, তখন বাড়ির লোকদের কি মনে হবে? হয় আমি খুব দৌড়ে দৌড়ে এসেছি আর তা নাহলে আমার শরীর খারাপ হয়েছে। বাড়ি ফিরে আমি খুব হাসি মুখে কথা বলছি, তখন বাড়ির লোক ধরে নিল আমি দৌড়ে দৌড়ে এসে ঘামিয়ে গেছি। বাড়ির লোক বলল – তুমি দৌড়ে দৌড়ে কেন এলে? বাড়ির লোক কি করে জানল যে আমি দৌড়ে এসেছি। এটাই হল অনুমান প্রমাণ। অনুমান মানে বাংলার অনুমান নয়, আমি অনুমান করলাম বা আমার অনুমানে মনে হচ্ছে এই রকম

হতে পারে, এই অনুমানের কথা অনুমান প্রমাণে বলা হচ্ছে না। অনুমান হচ্ছে একটা পরিভাষা যার অর্থ হচ্ছে দৃঢ় ও সন্দেহাতীত জ্ঞান। আমি দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বাইরে মাঠটা ভেজা। আমি বুঝে গেলাম যে বৃষ্টি হয়েছে, এখানে যেটা জানলাম একেবারের দৃঢ় ভাবে জানি যে বৃষ্টিই হয়েছে। এখানে এসে নৈয়ায়িকরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়, ন্যায় দুই রকমের হয় একটা Deductive Logic মানে কারণ দেখে কার্যকে জানা করা আরেকটি হচ্ছে Inductive Logic কার্যকে দেখে কারণকে বিশ্লেষণ করা। যখনই আমরা এটাকে Inductive Logic কে নিয়ে যাব তখন এটাই একটা পুরো একটা ফিলজফির কোর্স হয়ে যাবে, যার উপরে প্লেটো, এ্যরিস্টটলরা অনেক কাজ করেছেন। বেশির ভাব দার্শনিকরা তর্ক করার জন্য প্রশ্ন তোলেন যে – তুমি যে এটাকে অনুমান প্রমাণের জন্য ভিত্তি করেছ এর কোন দামই নেই। তখন এই নিয়েই অনেক তর্কাবিতর্ক হবে। আমাদের সেটা আলোচ্য নয়।

তারপরে আসছে শব্দ প্রমাণ। শব্দ প্রমাণ হচ্ছে শ্রুতি প্রমাণ, তার মানে আমাদের বেদে এটা আছে সেইজন্য এটাকে আমি সত্য বলে জানছি। এখন যারা খ্রীশ্চান বা মুসলমানরা কি মানবে শব্দ প্রমাণকে? তারা বলবে তোমার বেদে আছে তাতে আমার কি যায় আসে। আর যারা ঘোর ভৌতিকবাদী তারা শব্দ প্রমাণকে তো মানবেই না, অনুমান প্রমাণকেও উড়িয়ে দেয়। তুমি বড়লোক আমি সাধারণ লোক হয়ে জন্মেছি, তুমি সব সময় সুস্থ আর আমি রোগগ্রস্থ হয়ে জন্মেছি, এর আবার অনুমান কি, এর কারণ অন্য কোথাও হবে। যদি বলা হয় জেনেটিক কারণে এই রকম হয়েছে, তারা বলবে জেনেটিক্সেরও আবার কারণ থাকে নাকি। অনুমান-টনুমান আমরা বিশ্বাস করিনা, চোখের সামনে যা দেখব সেটাকেই মানব, আর কিছু বিশ্বাস করি না। এটাই হচ্ছে চার্বাকদর্শনের মত। এইভাবে বিভিন্ন দর্শনে জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন পন্থার কথা বলা হয়েছে।

তারপরে আসছে অভাব প্রমাণ। একটা জিনিষ নেই, মানে যেটার অভাব আছে সেই বস্তুর অভাবই সেই বস্তুকে জানার একটা পদ্ধতি। এখানে যদি একটা বোতল থাকে তাহলে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পারব যে এখানে একটা বোতল আছে। এখন যদি বলি এখানে দেখুন তো একটা গাধা আছে কিনা। দেখলাম গাধা নেই, এটা হয়ে গেল অভাব প্রমাণ। একটা জিনিষ নেই সেইটাও হচ্ছে জানার একটা পদ্ধতি। এই জিনিষটা আমাদের খুব সংশয় তৈরী করে, এখানে একটি বোতল নেই আরেকটি বোতল আছে তাহলে দুটোই তো প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। তাহলে হঠাৎ অভাব কেন বলতে যাচ্ছেন। যারা অভাব প্রমাণ তৈরী করেছেন তাদের একটা যুক্তি আছে কেন অভাব প্রমাণকে একটা আলাদা জানার পদ্ধতি করা হচ্ছে। আর অভাব প্রমাণকে যদি সঠিক বলে না মানা হয় তাহলে বেদান্ত দর্শন পুরো ভেঙ্গে চৌচিড় হয়ে যাবে, বেদান্তের আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। অন্যান্য দর্শনের সাথে যখন বেদান্তের লড়াই হয় তখন প্রথমে এই অভাব প্রমাণ নিয়ে সবাই বেদান্তের উপরে আক্রমণ করে। আর যদি বলে দেওয়া হয় অভাবতো প্রত্যক্ষই, দেখতে পাচ্ছি যে একটা জিনিষ নেই এইটাই তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে গেল, তাহলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অভাব প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য কোথায় রইল। কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। একটা জিনিষকে ওখানে দেখার কথা আমি ভাবছিলাম সেটাকে দেখতে পাচ্ছি এটা আমার মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলছে, আবার যদি না দেখতে পাই সেটাও আমার মনের মধ্যে সক্রিয় ছাপ ফেলছে যে, জিনিষটা নেই। অভাব প্রমাণ কখনই নেতিমূলক কিছু হচ্ছে না, যখনই এটাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে সেটা নেতিবাচকে হয়ে যাবে, অভাব প্রমাণে এটা স্পষ্ট রূপে জ্ঞান হচ্ছে।

এখন যদি বলে অন্ধকার মানেই তো আলোর অভাব, অন্ধকারকে কি কখন দেখা যায়? তখন এনারা বলবেন – তোমার কথাটা ঠিক, অন্ধকার হচ্ছে আলোর অভাব, কিন্তু এখানে এটা মিলবে না, এই মিলটা এক নয়। আমি অন্ধকারকে অন্ধকার বলতে পারি, কিন্তু 'তুমি অন্ধকার ছড়াচ্ছ' এই কথাট কোথাও শোনা যাবে না, এখানে আমরা বলি আলোটা নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলো নিবিয়ে দেওয়া আর অন্ধকার করা একই জিনিষ। তাই এখানে এই যুক্তি কোন দিক দিয়েই খাটবে না।

বেদান্ত অধ্যয়ণ করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শব্দ প্রমাণ আর অভাব প্রমাণ অত্যন্ত জরুরি, অনুমান প্রমাণের অতটা গুরত্ব নেই। পূর্বমীমাংসা অভাব প্রমাণকে মানে না, আর বৌদ্ধ, জৈন, যোগ, সাংখ্য এরাতো মানবেই না, এরা বলবে অভাব আবার কি, সব প্রত্যক্ষ। এইখানেই বেদান্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না যদি অভাব প্রমাণকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। বেদান্তের অনেক কিছু দাঁড়িয়ে আছে শুধু এই অভাব প্রমাণ কোন কিছুকে জানার একটা অকাট্য প্রমাণের জন্য। ইংরাজীতে একটা কথাকে খুব সুন্দর করে বলা হয় - He was conspicuous by his absence। conspicuous কথার অর্থ হচ্ছে দৃষ্টিগোচর হওয়া। একটা ক্লাশে একজন ছাত্র ইউনিফর্ম না পড়ে একটা চক্‌রাবক্‌রা জামা প্যান্ট পড়ে মাথায় টুপি লাগিয়ে ক্লাশে বসে আছে তখন ইংরাজীতে বলবে – The student become conspicuous by his dress ছাত্রের সাজপোশাক ক্লাশের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এখন সেই ছাত্রকে তার এই উদ্ভট পোষাকের জন্য শিক্ষক প্রচণ্ড তিরস্কার করেছেন, এমন ভাবে সবার সামনে বকলেন যে সেই ছাত্র এমন অপমানিত বোধ করল যে পরের দিন সে ক্লাশে অনুপস্থিত হয়ে গেল, তখন বলা হবে He was conspicuous by his absence. তাকে সবাই ক্লাশে আশা করেছিল কিন্তু সে ক্লাশে ছিল না, এটা হচ্ছে positive absence. এর ঠিক উল্টোটা হচ্ছে ভাব, মানে জিনিষটা আছে। প্রত্যক্ষ হচ্ছে ভাব আর অভাব হচ্ছে এর ঠিক বিপরীত। আবার প্রত্যক্ষ না হলেই সেটা কিন্তু অভাব প্রমাণ হয়ে যাবে না। এ ঘরে অনেক কিছু নেই হাতি নেই, ঘোড়া নেই, বাঘ নেই, 'নেই' এর একটা তালিকা বানালে বিশাল হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা তা করছি না, একজনের আসার কথা ছিল সে এখানে নেই, তার অনুপস্থিতি আমাকে তার জ্ঞান লাভ করিয়ে দিচ্ছে, এইটাই হচ্ছে অভাব প্রমাণ।

সাধারণ অবস্থাতে সৎ যখন বলছি, মানে একটা জিনিষ আছে, তাকে ছটি প্রমাণের, মানে কোন কিছুকে জানার যে ছয়টি প্রক্রিয়া আছে তার যে কোন একটার দ্বারা সিদ্ধ হতে হবে। আর এই ছয়টি প্রমাণই হচ্ছে যে কোন কিছুর জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ। এই ছয়টি প্রমাণকে বলে ষট্‌প্রমাণ। এই ষট্ প্রমাণ দিয়ে যে জিনিষটাকে জানা যায় সেইটা হচ্ছে সৎ, অর্থাৎ তার অস্তিত্ব আছে।

তাহলে সৎকে আমরা দেখলাম এবারে অসৎ হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। আমরা যখন চিন্তা করি, ঘুমাই, গল্প করি, খাওয়া দাওয়া করছি সব সময় আমাদের মনে নানা ধরণের ঢেউ উঠছে, স্বামীজী রাজযোগে যাকে বলছেন জলাশয়ে পাথর পড়ছে। মনের মধ্যে যে ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছে এটাকেই বলছে জানা। আমরা যা কিছু জানছি এটা কিভাবে হচ্ছে? বাইরে থেকে কোন উত্তেজনা মনের মধ্যে গিয়ে ঢেউ তুলল, তখনই আমাদের কোন জিনিষের জ্ঞান হয়ে গেল, জানার ব্যাপারটা ভেতরে হয় আর আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা বাইরে থেকে এসে চৈতন্যের সাথে জুড়ে গিয়ে আমাদের জ্ঞান হয় যে এটা আমরা জানলাম। আমি ক্লাশে লেকচার দিচ্ছি, ক্লাশের সবার কাছে আমি হচ্ছি এখানে একটা বাইরের উত্তেজনা। যেমন কাঁচের বোতলের বাইরে চুম্বক নড়ছে আর বোতলের ভেতরে লোহা নড়ছে, ঠিক তেমনি সবার ভেতরে বুদ্ধিতে যে চৈতন্য রয়েছে সেটা নড়ছে, এখন বুদ্ধিতে যে কম্পন হচ্ছে চৈতন্য সেই কম্পনের সাথে একাত্ম হয়ে পড়ছে। সেইজন্য আমরা কখনই বাইরের জগতকে জানতে পারিনা, আমার মনের ভেতরে যে বৃত্তি গুলি হচ্ছে সেটাকেই আমরা জানছি। এই তত্ত্বটাই আবার দুটো দর্শনের জন্ম দিচ্ছে – Subjectivism, অধ্যাত্মবাদ and Objectivism, বস্তুবাদ বা বিষয়বাদ। জিনিষটা কি বাইরে আছে না নেই, Subjectivism বলবে বাইরে কোথায় আছে, ওটা একটা উত্তেজনা, যা হবার তোমার ভেতরেই হচ্ছে, Objectivism আবার বলবে যা আছে বাইরেই আছে, বাইরে আছে বলেই তো তুমি জানতে পারছ, বাইরে যদি নাইই থাকত তাহলে তোমার জানার কোন প্রশ্নই আসত না। এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। প্লেটো ছিলেন Subjectivist কিন্তু তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল ছিলেন Objectivist.

এগুলো যদিও খুব জটিল মনে হবে, কিন্তু এই জিনিষ গুলি যদি পরিষ্কার না হয় আর এর পার্থক্যটা যদি না ধরা যায় তাহলে আমরা শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি ধারণাই করতে পারব না। যেটা বলা হল তা

হচ্ছে আমাদের মনের ভেতরে খেলা চলছে। এই যে বাইরে টেবিল, গ্লাশ, মাইক সব আমার মনের মধ্যে খেলা করছে বৃত্তি রূপে। বৃত্তি হচ্ছে চিত্তের মধ্যে চৈতন্যের কম্পন হওয়া। যখন ভাব বৃত্তি তৈরী হয়, অর্থাৎ যে জিনিষটা আছে সেটা আমার চিত্তের মধ্যে এমন একটা বৃত্তি তৈরী করে দেয় যার ফলে মনে হবে এটা আছে, এইটাই হচ্ছে সৎবৃত্তি বা ভাববৃত্তি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোন্তস্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।*।(২/১৬) অর্থাৎ সৎ থেকে কখন অভাবের সৃষ্টি হয় না, অভাবের থেকে কখন সৎ এর সৃষ্টি হয় না। এই শ্লোকটাকেই বিভিন্ন আচার্যরা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সৎ বৃত্তি আমাকে একটা বৃত্তি দিচ্ছে সেটা হচ্ছে এই জিনিষটার অস্তিত্ব আছে। অসৎ বৃত্তি হচ্ছে যেটা থেকে সেই বস্তুটার অস্তিত্বহীনতার বৃত্তি তৈরী করছে।

একজন নামকরা জার্মান থিয়োলজিয়ান টমাস এ্যকোইনিয়ার খুব বড় খ্রীশ্চান সাধু ছিলেন। তিনি যখন সেমিনারিতে ছিলেন, অর্থাৎ যেখানে খ্রীশ্চানারিদের পড়াশোনা করান হয়, সেই সময় তাঁর শরীরটা খুব স্থূলকায় ছিল। ওখানে সবাই আড়ালে তাঁকে ষাঁড় বলে ডাকত। যারা ধর্মের পথে থাকেন তাদের বেশির ভাগই এসব জিনিষ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। কিন্তু টমাস এইসব ব্যাপারে খুব সিরিয়াস ছিলেন। একদিন তাঁর দুজন সহপাঠি মজা করে তাঁকে বলছেন – দ্যাখো দ্যাখো একটা ষাঁড় আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের কাউকে যদি এই কথা বলা হয় যে আকাশ দিয়ে একটা ষাঁড় উড়ে যাচ্ছে, আমরা নিশ্চয়ই কেউ জানলার কাছে দৌড়ে গিয়ে দেখতে যাবো না। কিন্তু টমাস সোজা দৌড়ে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। এই কাণ্ড দেখে ক্লাশের সবাই হো হো করে হাসতে শুরু করে দিয়েছে। উনি কিছু না বলে জানলার কাছ থেকে সরে এসে আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন। তখন একজন তাঁকে বলছে 'তোমার মাথাটা কি মোটা? এতটুকু বুদ্ধিও কি তোমার নেই যে আকাশ দিয়ে ষাঁড় উড়ে যেতে পারে কখন'। টমাস তখন উত্তর দিচ্ছে 'আকাশ দিয়ে একটা ষাঁড় উড়ে যাচ্ছে এটা আমি বিশ্বাস করব কিন্তু একজন ভাবী খ্রীশ্চান সন্ন্যাসী কখন মিথ্যা কথা বলবে, এটা আমি কোন দিনই বিশ্বাস করতে পারব না'। এই কথাতে সবার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। যখনই কেউ বলবে আকাশে ফুল ফুটেছে, ডানাওয়ালা গাধা বা ঘোড়া উড়ে যাচ্ছে তখন আমাদের মনের মধ্যে ভাব বৃত্তি আসবে না, তার বদলে আসছে অভাব বৃত্তি। চৈতন্য ভাবটা আসছে কিন্তু সেই ভাবটা একটা নেতিমূলক ভাবের উদয় হয়ে বলে দিচ্ছে যে এই জিনিষটার কোন অস্তিত্বই নেই। যখন অভাব বৃত্তির চৈতন্য হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে অসৎ। অসৎ হচ্ছে অভাব বৃত্তিযুক্ত চৈতন্য।

আমরা সৎ আর অসৎ এর পার্থক্যটা দেখলাম। কিন্তু এখন যদি এর অর্থ করে দিই সৎ মানে যেটা আছে আর অসৎ মানে যেটা নেই, তাহলে নাসদীয়সূক্তমের দর্শন পুরো মিথ্যা হয়ে একটা মামুলি কবিতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে।

নাসাদীয়সূক্তম্ বলছে সৃষ্টি কিভাবে হল। সৃষ্টির আগে সৎ ছিল না আর অসৎও ছিল না, মানে দৃশ্য জগৎ বলে কিছু ছিল না, যেটাকে আমি আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে, শব্দ দিয়ে, অনুমান দিয়ে জানতে পারি সেটা তখন ছিল না। তাহলে কি ছিল তখন? শূন্য ছিল কি? না, তখন শূন্যও ছিল না। কেন বলছেন তখন শূন্যও ছিল না? কারণ বলা হচ্ছে নো অসদ্ আসীদ্, অসৎও ছিল না, তার অর্থ অবৃত্তি, কিছু নেই সেইটাই নেই, নেই জিনিষটাই নেই। আকাশ কুসুম হচ্ছে অসৎ মানে কখনই আকাশ কুসুম নেই, বন্ধ্যা পুত্র হচ্ছে অসৎ। তাহলে কি ভগবান অসৎ, না, ভগবান কখনই আকাশ কুসুমের মত, বন্ধ্যা পুত্রের মত অসৎ হন না। তাহলে কি করে জানা যাবে ভগবানকে? শব্দ প্রমাণের দ্বারা ভগবানকে জানা যাচ্ছে। কেননা ভগবান প্রত্যক্ষ প্রমাণ হবে না, এই সাদা চোখ দিয়ে ভগবানকে দেখা যাবে না। ভগবানকে অনুমান প্রমাণ দিয়েও জানা যাবে না। যেহেতু ভগবানকে শব্দ প্রমাণ দিয়ে জানা যায় সেইজন্য তিনি অসৎ নন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না, তাই তিনি সৎ নন। সেইজন্য বলা হচ্ছে সৎ ছিল না, কিন্তু শব্দ প্রমাণে ভগবান আছেন, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ যতটা স্পষ্ট শব্দ প্রমাণ ঠিক একই ভাবে স্পষ্ট, তাই ভগবানকে অসৎ বলা যাবে না। অভাব প্রমাণের

মূল্যও এক রকম, কোন পার্থক্য নেই, কোন প্রমাণই দু-রকমের কথা বলবে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে ভগবানকে ধরা যাচ্ছে না তাই তিনি অসৎ আবার শব্দ প্রমাণ দিয়ে তাঁকে ধরা যাচ্ছে তাই তিনি অসৎ নন, সেইজন্য তখন কি ছিল সৎ ছিল না, সৎ কেন ছিল না? কেননা তখন দৃষ্টি প্রমাণ অর্থাৎ দেখার মত কিছুই নেই, শুধু যে ভগবানই নেই তা নয়, কিছুই নেই, সৃষ্টিই নেই, সৃষ্টি হলে তবেই তো কিছু দেখবে, দেখারও কিছু নেই, যে দেখবে সেও নেই, বিষয়ও নেই বিষয়ীও নেই। তাহলে কি কিছুই নেই, তাহলে তো বলতে হবে যে শূন্য থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে এলো। যদি বলা হয় ন সৎ আসীদ্, সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না বললেই বলতে হবে সৃষ্টিটা শূন্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু শূন্য থেকে কি করে সৃষ্টি হবে, তখন পুরোটাই অভাব হয়ে গেল, অভাব থেকে কি করে সৃষ্টি হবে। ফিজিক্সেও এই নিয়ে সমস্যা আসে, বিগ ব্যাং এর আগে পদার্থ কোথায় ছিল? তারা বলবে matter was in energy form, এনার্জী ফর্ম কোথায় ছিল? একটা পয়েন্ট ফর্মে ছিল। তার আগে কি ছিল? ফিজিক্স বলছে আমরা জানিনা।

অসৎও ছিল না, নাসদীয়সূক্তমের এই ভাব থেকেই বেদান্তের নির্দ্বন্দ্ব অদ্বৈত তত্ত্ব বেরিয়ে আসছে। এই অসৎকে যদি আমরা অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করি তাহলে সেটা অন্য দর্শন হয়ে যাবে। কেন অসৎও ছিল না বলছে আমরা আগেই বলেছি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না তাই বলা হচ্ছে নো সদ্ আসীদ্। সৃষ্টি ছিল না তার মানে কি কিছু ছিল না? বৌদ্ধরা যেমন নির্বাণকে বলছে প্রদীপ জ্বলছে ফুঁ মেরে নিবিয়ে দেওয়া হল, তাহলে আলো কোথায় গেল? কোথায় যাবে, কোথাও যায়নি আলোর অভাব হয়ে গেছে। এখানে বৌদ্ধদের মতানুযায়ী অভাবও হবে না, বলা হচ্ছে কিছু ছিল না অথচ কিছু ছিল। তাহলে সৎ বলা হচ্ছে না কেন? যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না, তাই বলা হল নাসদাসীন্ নো সদাসীত্। পরের দিকে এই গভীর তত্ত্বটা থেকেই বেদান্তের মূল তত্ত্বের জন্ম নিয়েছিল যেটা হচ্ছে দ্বৈতাদ্বৈতের পারে। আমাদের মন সব সময় দ্বৈত জগতের মধ্যেই থাকে, তাই দ্বৈতাদ্বৈতের পারে বলতে গেলে ঠিক কি বোঝায় আমরা ধারণা করতে পারিনা। সব থেকে সুন্দর উপমা সূর্য। সূর্যে দিন আছে, না রাত আছে? সূর্যে দিনও নেই রাতও নেই, দিন হলে রাতও হবে। সূর্য দিন ও রাতের অবস্থার পারে। যদি ধরে নেওয়া হয় সূর্যের তাপে মানুষের কিছু হবে না, সেই অবস্থায় কোন মানুষ যদি সূর্যে থাকে তখন সূর্যের মানুষকে পৃথিবীর মানুষ গিয়ে বলবে – বাঃ কি মজা এখানে সব সময় দিন। সূর্যের মানুষ অবাক হয়ে বলবে – দিনটা আবার কি জিনিষ? পৃথিবীর মানুষ বলছে – কেন এই যে সব সময় আলো থাকছে। সূর্যের মানুষ আরও অবাক হয়ে বলবে – আলো থাকাটা দিন কেন হবে, আলোর আবার বিপরীত কিছু আছে নাকি।

আরও সহজ ভাবে বোঝা যাবে – যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি পরীক্ষায় পাশ করেছ? আমি বললাম আমার এখনও পরীক্ষা হয়নি। সে আবার বলছে – আরে ছাড়ো না, পরীক্ষা হয়েছে কি হয়নি ছাড়ো, তুমি পাশ করেছ কিনা বল? আমি বলব – আপনি কি বোকার মত কথা বলছেন, পরীক্ষাই হয়নি তো পাশ ফেলের প্রশ্ন কোত্থেকে আসবে। সে বলছে – আরে ধুৎ, যারা পড়াশোনা করে তারা হয় পাশ করে না হয় ফেল করে, তোমার কোনটা হয়েছে, পাশ না ফেল? আমাদের মস্তিষ্কের একটা সীমাবদ্ধতা আছে, তার ফলে আমরা সব সময় দ্বৈত ভাবের বাইরে কিছু ভাবতেই পারিনা, জীবন-মৃত্যু, দিন-রাত্রি, সকাল-বিকেল, শীত-গ্রীষ্ম, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য। কিন্তু এগুলির পারেও একটা অবস্থা আছে। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা হয়নি, আমি জিজ্ঞেস করলাম – কটি গোল হয়েছে? আরে খেলাই শুরু হয়নি। খেলা শুরু হয়ে গেছে এখনও গোল হয়নি, তখন যদি জিজ্ঞেস করে কটা গোল হয়েছে, তাহলে বলবে শূন্য শূন্য। কিন্তু খেলা শুরুই হয়নি, তখন কি বলা যাবে যে স্কোর শূন্য শূন্য? কখনই বলা যাবে না, অঙ্কে এটাকে বলে পাই সেট। পাই সেট হচ্ছে খালি কিন্তু শূন্য বলা যাবে না, পাই আর জিরো তে তফাৎ আছে। পাইয়ের নিয়মে বলে – শূন্যও নয় একও নয় এটা হল পাই। এটাই বলছে - নাসদাসীন্ নো সদাসীত্, তখন এই জিরো আর ওয়ানের খেলা ছিল না, তখন পাই ছিল। একটা কিছু ছিল। কি ছিল? শূন্যও ছিল না, একও

ছিল না। আমি বলব – আরে জিরো নেই এক নেই তাহলে কি আছে বলুন? নাসদীয় সূক্তে এইটাই আমাদের বুঝতে হবে।

অসদ্ শব্দটা হচ্ছে যেটা নেই, যেটা বোঝা যায় না। অসদ্ আবার দু-রকমের হয়, একটা হচ্ছে যেটা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে দেখা যায় না কিন্তু অনুভূতি দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বেদান্ত যাকে অপরোক্ষানুভূতি বলছে। দ্বিতীয় হচ্ছে যত কিছুই হোক না কেন ত্রিকালে যেটাকে কেউ কোন দিনই দেখতে পারবে না তাকে অসদ্ বলছে। দ্বিতীয় অসদ্‌কে পৃথক ভাবে বোঝার জন্য পরে এটাকে নতুন একটা নাম দিয়ে বললেন অলীক। অলীক শব্দের যথার্থ অর্থ হচ্ছে যা কোন কালে ছিল না আর কোন কালে হবেও না। যেমন বন্ধ্যা পুত্র, বন্ধ্যার কোন দিন পুত্র ছিল না আর কোন দিন হবেও না, যদি পুত্র হয়ে যায় তাহলে সে আর বন্ধ্যাই থাকবে না। এগুলো হল contradictory in terms, যদি বলেন গরম গরম বরফ নিয়ে এসো, কিংবা ঠাণ্ডা গরম জল নিয়ে এস, বরফ মানেই ঠাণ্ডা আর গরম জল মানেই গরম হতে হবে। এই জিনিষ গুলিকে বলা হয় অলীক।

দর্শনে অসৎ আর অলীক এই দুটো শব্দ একই রকম মনে হয়। এই কারণে শাস্ত্র বিশেষ করে বেদ পড়তে গেলে ভাষ্য সহকারে না পড়লে একটা শব্দের অর্থ অনেক রকমের মনে হবে, আর শব্দের যদি ঠিক অর্থ না করা হয় তাহলে পুরো দর্শনটাই পাল্টে যাবে। যেমন মায়াকে কখন বলবে অলীক, কখন বলবে অসৎ আবার কখন বলছে সৎ। যখন কেউ বলে এই জগতে একমাত্র মায়াই আছে, যা কিছু দেখছ সব মায়া, তাহলে মায়া শব্দের অর্থ সৎ হয়ে গেল, কেননা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা যেটা দেখা যাচ্ছে তাকে মায়া যখন বলা হচ্ছে, তাহলে মায়া সৎ। আবার যেহেতু মায়ার প্রকৃত অস্তিত্বই নেই সেই হেতু মায়া অসৎ। এই অসৎকে যখন এরা অলীক অর্থে নিয়ে নেয় তখন মায়া কখন ছিল না আর মায়া কখনই নেই, তার ফলে তারা বলছে জগৎ বলে কিছু নেই, বেদান্ত যেমন বলছে ত্রিকালমে জগৎ নহি হ্যায়। সেইজন্য শাস্ত্রে যখন এই ধরণের শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ খুব জটিল হয়ে যায়, আর এই নিয়েই পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে। আবার ঈশ্বরকেও কখন কখন বলে দেবে সৎ আবার কখন বলে দেবে সৎ অসৎএর পার, অবশ্য কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরকে অলীক কখন বলবে না। মায়াকে যেমন কখন বলছে সৎ আবার কখন বলছে অসৎ তেমনি মায়াকেও বলে দেয় সৎও নয় অসৎও নয়। যখন মায়াকে সৎ নয় অসৎ নয় বলছে তখন এই অসৎ বলতে বোঝাচ্ছে অলীককে। অর্থাৎ মায়া বলে যে কিছুই নেই তা নয় আবার তার চিরন্তন অস্তিত্ব নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে ভগবানকে সৎ দিয়ে বোঝাবে, যখন বলছে একমাত্র তিনিই আছেন তখন ভগবানকে সৎ দিয়ে বোঝান হচ্ছে। তার মানে ঈশ্বরই একমাত্র সৎ আর বাকি সব অসৎ। এখানে সৎ মানে যার একমাত্র সত্তা আছে বাকী কারুর সত্তা নেই। এইজন্য সৎ আর অসৎ এই দুটো শব্দ প্রচণ্ড জটিল। গীতাতেও কোথাও কোথাও মায়াকে বলে দিচ্ছে সৎ কখন অসৎ বলছে আবার কখন বলছে মায়া সৎ অসতের পার। যদি আমরা প্রথম থেকে একটা বাঁধা অর্থ না ধরে রাখি তাহলে গীতার অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে যাবে। এইখান থেকেই শাস্ত্র যে তত্ত্বটাকে দিতে চাইছে সেটাকে না ধরতে পারার জন্য অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়ে যায়। আমাদের মোটামুটি মনে রাখতে হবে সৎ মানে আছে অসৎ মানে নেই, এইটাকে মাথায় রেখে নাসদীয়সূক্তম্‌কে ঠিক কি বলতে চাইছে তা বোঝার চেষ্টা করব।

এইখানে প্রথম মন্ত্রে প্রথমেই বলছে সৎ ছিল না, এর অর্থ হচ্ছে জগৎ ছিল না। অসৎ ছিল না, এর মানে একেবারেই যে কিছু ছিল না তা নয়, কিছু একটা ছিল। সৃষ্টি ছিল না মানে দ্রষ্টা কেউ নেই তাহলে দৃশ্য কি করে থাকবে, কিন্তু কিছু যে একটা ছিল সেইটা আমরা কিভাবে জানছি? শব্দ প্রমাণের মাধ্যমে জানছি, অর্থাৎ বেদ এই কথা বলছে। ঈশ্বর সর্ব কালেই আছেন। কিন্তু আমরা কি করে জানব যে তিনি হাজার বছর আগে ছিলেন কি ছিলেন না? তিনি যে ছিলেন এটা আমরা জানছি বেদের মাধ্যমে, মানে শব্দ প্রমানের দ্বারা। যেমন ইতিহাসের ঘটনাগুলি ঐতিহাসিকদের গবেষণা আর অনুসন্ধানের পর যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার মাধ্যমে জানছি, ঠিক তেমনি ঈশ্বরের সর্বকালের অস্তিত্বের কথা আমরা জানছি

যেখানে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আধ্যাত্মিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের খবরাখবর সংগ্রহিত করা হয়েছে তার মাধ্যমে অর্থাৎ বেদের মাধ্যমে। ঈশ্বর যদি সর্বকালেই না থাকেন তাহলে এই জগৎটা হয়ে যাবে অভাব, শূন্য থেকে সৃষ্টি, যার কোন অর্থই হয় না।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে – *সদীদমগ্রে আসীদ্ সৌম্য,* হে সৌম্য, আগে শুধু মাত্র সৎ ছিল। এখানে নাসদীয়সূক্তে বলছে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, তাহলে তো দুটোর মধ্যে বিরোধ লেগে যাবে। উপনিষদের আরেক জায়গায় বলছে – *অসদ্বা ইদমগ্রে আসীদ্* - এখানে বলছে আগে অসৎ ছিল। উপনিষদে এক জায়গায় বলছে আগে অসৎ ছিল, আরেক জায়গায় বলবে আগে শুধু সৎ ছিল, কিন্তু বেদে বলছে আগে সৎ ছিল না অসৎও ছিল না, আবার এক জায়গায় গিয়ে বলছে সব কিছু সৎ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আবার এক জায়গায় বলছে সব কিছু অসৎ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে আমরা কোনটা নেব। কিন্তু বেদ উপনিষদ একই তত্ত্ব এক ভাবেই বলে গেছেন, কিন্তু বলছে অন্য ভাবে, সেখানেই তখন ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টির প্রথমে কি ছিল বলতে গিয়ে বলবে মায়া ছিল কিংবা ব্রহ্মণ্ ছিল কিংবা আত্মাই ছিল, এই ভাবে বলে নিয়ে তারপরে একটা সুসংবদ্ধ তত্ত্বকে দাঁড় করাবে।

নাসদীয়সূক্তের এইখানে সৎ মানে এই আর অসৎ মানে এই, এই ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে তাই সৎ ও অসৎ এর এত বিস্তৃত আলোচনা করা হল। এটা যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে নাসাদীয়সূক্তম্ পড়তে গিয়ে আমরা এর তত্ত্বকে হারিয়ে ফেলব। যেমন কর্ম বলতে অনেক কিছু বোঝায়, কারুর মনে হবে কর্ম মানে কাজ করা, কারুর মনে হবে কর্মফল বা কপাল, আমার কর্মে ছিল বা আমার কপালে ছিল, আবার কর্ম বলতে বর্তমান কর্মফলকে বোঝায় আবার কর্ম বলতে যজ্ঞকে বোঝায়। ঠিক তেমনি আত্মা শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আত্মা মানে হয় জীবাত্মা, আত্মা মানে হয় দেহাত্মা, আত্মা মানে ভেতরে যিনি চৈতন্য রয়েছেন, আবার আত্মা মানে হচ্ছে ব্রহ্ম, আত্মার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি, আত্মার অর্থ হচ্ছে প্রাণ। কোন্ জায়গায় আত্মার কোন্ অর্থ এটা আচার্যের কাছে অধ্যয়ণ না করলে আত্মার অর্থ ভুলভাল করে পুরো দর্শনটাই তালগোল পাকিয়ে যাবে। সেই কারণে অনেকেই বিরক্ত হয়ে বলেন একই শব্দের এতগুলি অর্থ কেন করা হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে তখনকার সময়ে শব্দের এত বৈচিত্র্যতা ছিল না, গুরু শিষ্যকে বলে দিচ্ছে, শিষ্য বুঝে নিচ্ছে এইভাবে পরম্পরা চলে এসেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন শব্দকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেই ধরণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকাতে কেউ সাহস করে পুরনো শব্দের বদলে নতুন শব্দকে প্রয়োগ করতে পারেনি। এই কারণেই গীতা ও উপনিষদ বা যে কোন শাস্ত্র পড়তে গেলে ঠিক ঠিক আচার্যের কাছে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে আর ধরে ধরে পড়তে হয়। এত কঠিণ আর সাধন সাপেক্ষ বলে আমাদের দেশের লোকেরা বেদ পড়া ছেড়ে দিল।

যারা ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকে তাদের লোকেরা বলে বেশ আছে হরিনাম করছে আর বসে বসে খাচ্ছে। এখানে এসে বোঝা যায় ঠিক ঠিক ধর্মকে জানতে হলে কি প্রখর মেধা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের এক জায়গায় আছে, শঙ্করাচার্য নিজেই বর্ণনা করছে – বিরাট তর্ক চলছে, হঠাৎ পূর্বপক্ষ হাত তুলে বলবে 'ভাই, তোমরা যারা বেদান্তীরা আছ, তোমরা নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত তার ওপরে আবার একটা শব্দের অনেক রকম অর্থ বার করে অপর পক্ষের মনেতেও সংশয় করে দিচ্ছ, সত্যি ভাই সেইজন্য তোমাদের বেদান্ত আর কেউ পড়ে না'। বিরোধী পক্ষের অভিযোগকে নিজেই উত্থাপন করে শঙ্করাচার্য তারপর তার পরিসমাপ্তি করছেন 'তুমি যা বলছ ঠিকই বলছ, বেদান্ত পড়তে গেলে তাই মনে হবে, কিন্তু বেদান্ত আসলে তা নয়, ঠিক ঠিক নিষ্ঠার সাথে গুরুর কাছে যখন শোনা হয় তখন গুরু এক কথায় সব পরিষ্কার করে দেন'। শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বোঝা অত্যন্ত কঠিণ, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর পবিত্রতা না হলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কিছুই ধারণা করা যায় না।

একটা খুব প্রচলিত ঘটনা আছে – লাটু মহারাজ লেখাপড়া করেননি, জাগতিক বিচারে মুর্খ বোকা মানুষ ছিলেন। ঠাকুরের শরীর যাবার পরে লাটু মহারাজের জীবনী যদি আমরা পড়ি তাহলে দেখতে পাব যে এই অশিক্ষিত সহজ সরল গ্রাম্য মানুষটির কি প্রচণ্ড সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন, সবাই বিদেশে স্বামীজীর সব কীর্তি কাহিনী শুনছেন, লাটু মহারাজও শুনছেন। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে লাটু মহারাজ স্বামীজীকে বলছেন 'লোরেন ভাই, তুমি নতুন কি আর করেছ, তুমি তো গীতা উপনিষদের কথাতে দাগা বুলিয়েছ'। স্বামীজী সবাইকে বলছেন 'দ্যাখ্, লাটু ঠিক ঠিক জিনিষটাকে ধরেছে'। আমরাও তো স্বামীজীর কত রচনা পড়ছি কিন্তু আমরা ধরতে পারছি না, অথচ স্বামীজী যত কথা বলেছেন গীতা উপনিষদের বাইরে একটি কথাও বলেননি। কিন্তু লাটু মহারাজ খচ্ করে ধরে নিচ্ছেন, অথচ আপাত ভাবে গীতা উপনিষদ তিনি কখন পড়েননি। এইটাই হচ্ছে সূক্ষ্ম বুদ্ধি।

লাটু মহারাজ ঠাকুরের কাছে বর চেয়েছিলেন যে আমি যা খাই সেটা যেন হজম হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থুল শরীর চলে যাবার পর বরাহনগর মঠে তখন পয়সা কড়ির খুব অভাব, কোন রকমে সব গুরুভাইদের দিন গুজরান হচ্ছে। এক গুরুভাই ঠাকুরের জন্য রোজ সকালে একটা ছোট বাটিতে নৈবেদ্য ভোগ দিতেন। রাত্রে সবার খাওয়ার পর ঐ পাত্রটাকে খুব সুন্দর করে মেজে ঘষে পরিষ্কার করে রাখা হত যাতে সকালে উঠেই ঠাকুরকে ঠিক সময়ে ভোগ নিবেদন করা যায়। লাটু মহারাজ রাতে উপোস করে সারা রাত ধরে মশগুল হয়ে জপ করে যাচ্ছেন। গভীর রাত্রে কোন এক সময়ে তাঁর জপ ভেঙ্গেছে, আর এমনই কপাল যে সেই সময় তাঁর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। কিন্তু অত রাত্রে কিছুই খাবার নেই। কি খাবেন? ওনার কাছে সব সময় ছোলা থাকত, সেখান থেকে একটু ছোলা নিলেন, একটু পেঁয়াজ কুচোলেন। তারপর ঠাকুরের ধোয়া মাজা পরিষ্কার বাটিতে করে সেদ্ধ করে খেলেন। খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাটিটা নোংরাই থেকে গেছে। সকালবেলা বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরকে নৈবেদ্য দিতে গিয়ে দেখে বাটিতে ছোলা পেঁয়াজ লেগে আছে। এই দেখে বাবুরাম মহারাজ লাটু মহারাজকে ঘুম থেকে তুলে প্রচণ্ড গালাগাল দিতে শুরু করল, শেষে বাপ-মা তুলেও গালাগাল দিতে লাগল। লাটু মহারাজ কিছুক্ষণ শোনার পর বলছেন 'বাবুরামদাদা, তোমার বাপ-মা আর আমার বাপ-মা কি আলাদা'? এই একটা কথায় বাবুরাম মহারাজ একেবারে চুপ্‌সে গেলেন। তোমারও বাপ-মা সেই ঠাকুর আর আমারও বাপ-মা সেই ঠাকুর। লাটু মহারাজের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি। তাই বলে কি বাবুরাম মহারাজের বুদ্ধি ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, সূক্ষ্ম বুদ্ধি না থাকলে বাবুরাম মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যেতেন না, তিনিও বুঝে গেছেন লাটু মহারাজ কি বলতে চাইছেন। আচার্য শাস্ত্র বলতে শুরু করেছে আর শিষ্য ঝরঝর করে সব বুঝে নিচ্ছে এই ধরণের সূক্ষ্ম বুদ্ধি না থাকলে আধ্যাত্মিক উত্থান হয় না।

মুণ্ডোক্য উপনিষদে শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে উত্তম শিষ্য, মধ্যম শিষ্য ও অধম শিষ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন – উত্তম শিষ্য একবার শুনলেই বুঝে নেয় আচার্য কি বলতে চাইছেন, মধ্যম শিষ্যকে বারবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে নানা উপমা দিয়ে বোঝান হয় আর অধম শিষ্যকে যেটা বোঝান হয় সে তার উল্টোটাই বোঝে। স্বামীজী, রাজা মহারাজ এনারা ছিলেন উত্তম শিষ্য। উত্তম শিষ্যকে একবার বলে দিল 'তত্ত্বমসি' তুমিই সেই, সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে নেবে এর অন্তর্নিহিত ভাব। স্বামীজীকে ঠাকুর কিছুই বলেননি, শুধু একটু ছুঁয়ে দিয়েছেন তাতেই স্বামীজীর বিরাট আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়ে গেল, স্পর্শেই তাঁর অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেল। ঠাকুরতো আরো অনেককেই স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু আর কারুর তাহলে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হল না কেন? আমাদেরও তাই হয় না।

তবে উত্তম শিষ্য যদি নাই হতে পারি কিন্তু কম পক্ষে যাতে মধ্যম শিষ্যও হতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই উল্টোটা যেন না বুঝি। সেইজন্য তপস্যা সবাইকে করতে হবে, তপস্যা সাধন ভজন না হলে মন পবিত্র হবে না। জপ ধ্যানে বুদ্ধি সূক্ষ্ম হয়। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এগুলির সাথে সচেতন ভাবে লড়াই করতে হবে। আমাকে এটা ধারণা করতেই হবে, ধারণা করে

গেলে, বুঝতে গেলে আমাকে আমার সমস্ত প্রকারের রিপুর সাথে লড়াই করতে হবে, সাথে সাথে মাটি কামড়ে সাধনা করতে হবে, এই দৃঢ়তা না থাকলে শাস্ত্র কোন দিন বোঝা যাবে না। শাস্ত্র যদি না ধারণা করা যায় তাহলে কোন কালেই, ধার্মিক পুরুষ, আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে পারবে না। জীবনে আমাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু একটা চাই, তা নাহলে কি অবলম্বন করে আমরা বেঁচে থাকব। লোকে টাকা-পয়সা উপার্জন করে তা ভোগের জন্যই তো করে, কিন্তু টাকা-পয়সাকে কেউ ভোগ করে না, এগুলো কোন একটা দিকে আমাদের এগিয়ে দেয়। যখন এগোতে থাকবে তখন বুঝতে পারে যে সব কিছুই সেই একটা দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য এই চারটে পুরুষার্থের কথা বলা হয় – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে চারটের মধ্যে কোনটাই হবে না। শাস্ত্র যদি না জানা থাকে, শাস্ত্র ধারণা করার ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে এই চারটের কোনটাই হবে না।

নাসদীয়সূক্তমের সৎ হচ্ছে যেটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গোচর করা যায়, অসৎ হচ্ছে সেইটা যেটাকে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গোচর করা যাচ্ছে না কিন্তু বেদের দ্বারা জানা যায়। যদি কেউ বলে আমি বেদ মানিনা, তাহলে তাকে বলতে হবে তুমি ভাই বেদ পড়ো না, নাসাদীয়সূক্তম্ তোমার জন্য নয়। যে বলবে আমি বেদ মানি তখন এই তত্ত্বটা তার জন্য। কেননা এটা হচ্ছে বেদ প্রমাণ যাকে অন্য ভাবে বলা হয় শ্রুতি প্রমাণ। যারা বেদ বা শ্রুতিকে মানে না তারা হলেন চার্বাকপন্থী। নাসাদীয়সূক্তম্ তাদের জন্যই বলা হয়েছে যারা এই সৃষ্টির রহস্যকে আধ্যাত্মিকতার আলোকে জানতে চায়।

তদানীং, মানে সেই সৃষ্টি কালে সৎ ছিল না অসৎ ছিল না। *নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ* - ন আসীদ্ রজো বলছে, এই রজঃ শব্দের অনুবাদ আবার খুব কঠিণ হয়ে যায়। কারণ বেদের ভাষা অনেক পুরনো। যার জন্য পরে যাস্কের নিরুক্তাদির রচনা হয়েছে, তাও বেদের অনেক পরে, তারও পরে সায়নাচার্য এটাকে ব্যাখ্যা করছেন। এখন রজঃ শব্দকেও অনেক ভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। যে ভাবেই আমরা অনুবাদ করব এর অর্থ পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। রজঃকে স্বামীজী অনুবাদ করছেন there was no air, কিন্তু রজঃ কোন অবস্থাতে বাতাস বলে অনুবাদ করা যায় না। আবার স্বামীজী বলছেন firmament, যার অর্থ, যে জিনিষটা ধরে রাখে। স্বামীজী রজঃকে বাতাস বলে অনুবাদ করছেন এটা যে শুধু শব্দকে অনুবাদ করে দিয়েছেন তা নয়, এই শব্দের ব্যাখ্যাটা কি হবে সেটাকে ভিত্তি করে একটা অনুবাদ করে দিলেন। সেই সময় কোন বাতাস ছিল না, বাতাস নেই মানে কোন গতি ছিল না, গতি হচ্ছে রজগুণের ধর্ম। সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না বলার পর কি হতে পারে তার ব্যাখ্যা করার জন্য এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, রজঃ তাই হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক শব্দ। সৃষ্টির আগের অবস্থাটাকে বোঝানোর জন্য বলছে বাতাস ছিল না। বাতাস কোথায় চলে? বাতাসকে চলার জন্য আকাশ দরকার, তাই বলছে *নো ব্যোমা পরো যৎ*, পৃথিবীর উপরে আকাশ, আকাশের উপরে বাতাস। সৎ অসৎ ছিল না, মানে পৃথিবী ছিল না। পৃথিবী ছিল না ঠিক আছে, কিন্তু বাতাস তো ছিল? বিজ্ঞানের মতে প্রথমে বাতাস আসবে তারপর প্রাণী জগত আসবে। কিন্তু বলছে বাতাসও ছিল না। ঠিক আছে বাতাস নেই, তাহলে অন্তরীক্ষ তো আছে। না, আকাশও ছিল না। তাই স্বামীজী যে রজঃ কে বাতাস অনুবাদ করেছেন এখানে এসে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে স্বামীজীর এই অনুবাদটাই সঠিক, স্বামীজী ঋষি কিনা, তাই তাঁর অনুবাদও হবে ঋষিদের মতই, ঋষিরা যা বোঝাতে চেয়েছেন স্বামীজী সেটাকে ধরতে পেরেছেন বলেই এত সুন্দর যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ অনুবাদ করেছেন। এখন রজঃ মানে অনেক কিছুই হয়, যেমন বিরজা কথাটা রজঃ থেকে এসেছে। সন্ন্যাসীরা বিরজা হোম করেন। বিরজার অর্থ হচ্ছে যা কলুষ মুক্ত, কিন্তু এখানে রজর কলুষ অর্থ করা যাবে না, করলেই পরের শব্দে *নো ব্যোমা পরো যৎ* এসে গোলমাল হয়ে যাবে। কলুষের সাথে আকাশের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু বাতাসের একটা সম্পর্ক আছে, বাতাসের বাবা হচ্ছে আকাশ। আবার রজঃ মানে সক্রিয়, মানে শক্তি। শক্তিকেই এখানে ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে বাতাস রূপে।

বেদে যখন কোন জটিল শব্দ আসে তখন তার আগের শব্দের অর্থের সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অর্থ করা হয়। এমনকি যদি কোন বিশেষ শব্দের অর্থ যদি নির্দিষ্ট করা থাকে যে এর বাইরে এর অন্য অর্থ করা যাবে না, তখন আগের শব্দের অর্থের সাথে যদি এই অর্থের সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে সেই শব্দের অর্থকে পাল্টে এমন ভাবে ব্যবহার করা হবে যাতে তার আগের শব্দের অর্থের সাথে ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকে, আচার্য তখন বলে দেন – এই শব্দের এই অর্থ। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে একটা শ্লোক আছে *মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ*। (১৩/৬) মহাভূতের অর্থ হচ্ছে স্থূলভূত, যা দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। আচার্য শঙ্কর মহাভূতের অর্থ করছেন তন্মাত্রা, কিন্তু কোন শাস্ত্রেই মহাভূত মানে তন্মাত্রা বলা নেই, একমাত্র শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন 'এইখানে মহাভূতের অর্থ হবে তন্মাত্রা'। এখানে যদি মহাভূতের অর্থ তন্মাত্রা না করা হয় তাহলে এই শ্লোকের পুরো বক্তব্যটাই গোলমাল হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, গীতার মূল দর্শনটাই পাল্টে গিয়ে অন্য একটা দর্শনের জন্ম নিয়ে নেবে। সাংখ্য দর্শনও পুরো পাল্টে যাবে। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রে মহাভূত হচ্ছে স্থূলভূত। কিন্তু আচার্য এর অর্থ করে দিলেন সূক্ষ্মভূত। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে ব্যাসদেব কেন সূক্ষ্মভূত না বলে মহাভূত বললেন? এর উত্তরও কেউ দিতে পারবে না। ব্যাসদেব কেন করলেন আমরা কেউ জানিনা, হতে পারে সেই সময় তখনও শব্দের অত বৈচিত্র্যতা আসেনি, অনেক কারণ থাকতে পারে। তাই সব সময় বলা হয় আচার্যের কাছে শাস্ত্র না পড়লে কিছুতেই শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে পারবে না, আচার্যকেও সব দিক দিয়ে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করে নিতে হয়।

তাই এখানে আমরা স্বামীজী যে অর্থ করেছেন সেইটাকেই নেব, স্বামীজী বলছেন – সেখানে কোন বাতাস ছিল না, আর বাতাসকে ধরে রাখবে সেই আকাশও ছিল না। ব্যোম মানে আকাশ, কিন্তু ব্যোম বলতে অনেক কিছুকেই বোঝায়। ব্যোম বলতে আকাশও বোঝায় আবার অন্তরীক্ষকেও বোঝায়। ফিজিক্সের ভাষায় বলতে গেলে বলা হবে – there was neither space. পরের দিকে বলবে সময়ও ছিল না। এখন আকাশই নেই তাহলে শক্তি কোথা থেকে আসবে, শক্তি যে খেলা করবে, খেলার জন্য যে আকাশ দরকার সেই আকাশই নেই।

পরের লাইনে বলা হচ্ছে – *কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্*। আজকে যে সৃষ্টিকে দেখছি সেটা *কিমাবরীবঃ* কি দিয়ে আবৃত ছিল, *কুহ* কোথায় ছিল, *কস্য শর্মন্ অম্ভঃ* কার অধীনে ছিল। অম্ভঃ শব্দের অর্থ জল, হিন্দু পুরানে এটা একটা অদ্ভূত বিশ্বাস যে সব সৃষ্টি জল থেকে বেরিয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীতে সৃষ্টির বর্ণনাতেও আমরা দেখতে পাই নারায়ণ ক্ষীরসাগরে শুয়ে আছেন, এই দৃশ্যটাই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে যা কিছু সৃষ্টি সব জল থেকে এসেছে। এই জলের দ্বারা কিন্তু নদী বা পুকুরের জলের কথা বলা হচ্ছে না, অম্ভঃ হচ্ছে primordial water, এই অম্ভঃ শব্দটা আমাদের সৃষ্টির আদি তত্ত্বকে ইঙ্গিত করছে। আসলে প্রথম থেকে সমস্ত প্রাণীই জলের উপরে নির্ভরশীল হয়ে আছে, গাছ জল না পেলে শুকিয়ে যায়, মানুষ জল খেয়ে বেঁচে থাকে, আদিম কাল থেকে জলের বিরাট গুরুত্ব। সেইজন্য বেদে বলে অপো নারায়াণঃ, জলই নারায়ণ। এইখানে তাই যেমন বলছে বাতাস নেই, আকাশ নেই, তাহলে কোন্ জিনিষটা থেকে সৃষ্টিটা বেরিয়ে এল, তাই বলছে তাহলে কি সৃষ্টিটা primordial water থেকে বেরিয়ে এসেছে? তাহলে সেই দিব্য জল কোথায় ছিল? আমরা যখনই জিজ্ঞেস করি এটা কোথায় ছিল, তখন যেমন বলি গর্ভে ছিল, সব সমুদ্রের গর্ভে আছে। সেইজন্য বলে সৃষ্টিটা হিরণ্যগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে। হিরণ্যগর্ভ কোথায় ছিল? তখন বলছে প্রথমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে শুধু জল আর জল, সেই মহাজাগতিক দিব্য জলে (অম্ভঃ) হিরণ্যগর্ভ ছিল। এই জলকে কেউ দেখতে পায়না, সেখানে একটা সোনার ডিম ভাসছিল, তার নাম হল হিরণ্যগর্ভ, যা কিছু বেরিয়েছে সেখান থেকেই বেরিয়েছে। এটি বেদের খুবই প্রাচীন মত। *কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্*, ওটা কি গভীরে লুকিয়ে ছিল? যে ঋষি এই নাসাদীয়সূক্তম্ আবিষ্কার করেছেন, তিনি এইটা বলছেন।

তারপরের মন্ত্রে বলছেন – ***ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।।২)*** – তখন মৃত্যুও ছিল না অমৃতও ছিল না। কেন ছিল না? এই প্রশ্ন হয়ই না। বন্ধ্যা নারীকে যেমন প্রশ্ন করা যায় না, তোমার কি সন্তান হয়েছে, সন্তান হলে ছেলে না মেয়ে হয়েছে? এই প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। খ্রীষ্ট ধর্মে ভগবানের একটা গুণের কথা বলা হয়, তারা বলে ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, আর তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করছেন, তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টি কর্তা। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে – ভগবান কি এমন একটা পাথর সৃষ্টি করতে পারবেন যেটা তিনি তুলতে পারবেন না। যদি এর উত্তরে বলে এই রকম পাথর তৈরী হয় না, তাহলে ভগবানের সৃষ্টির ক্ষমতা নেই বলতে হয়। যদি বলা হয়, না তিনি তুলতে পারবেন না, তাহলে ভগবান সর্বশক্তিমান নয়। এগুলো হচ্ছে অমূলক প্রশ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ তো একটা ছোট পাথরই তুলতে পারতেন না, লুচি খেতে গিয়ে তাঁর হাত কেটে যেত।

প্রকেতঃ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইঙ্গিত বা চিহ্ন করা। এমন কোন চিহ্ন ছিল না যেটা দিয়ে বোঝা যাবে এটা দিন না রাত। আমরা ভাবব এটা কি ধরণের কথা হল, হয় আলো থাকবে না হয় অন্ধকার থাকবে। মৃত্যু কোথায় আছে? যখন সৃষ্টি হয়ে গেছে সেখানে জন্ম-মৃত্যু হবে। সৃষ্টি মানেই দ্বৈত স্বরূপে চলে এসেছে। দ্বৈত মানে দিন থাকবে রাত থাকবে, সুখ থাকবে দুঃখ থাকবে, ধর্ম থাকবে অধর্ম থাকবে, পাপ থাকবে পূণ্য থাকবে, মৃত্যু থাকবে অমরত্ব থাকবে। যেই সৃষ্টির ওপারে চলে যাবে তখন নির্দ্বন্দ্ব, কোন দ্বৈত ভাব থাকবে না। দ্বৈতের পারে চলে গেলে কি থাকবে, দুই থাকবে না, একও থাকবে না আবার শূন্যও থাকবে না, কি থাকবে মুখে বলা যাবে না। অদ্বৈত মানে কখনই এক নয় দুইও নয়, অদ্বৈত মানে এক দুইয়ের পার। ঠাকুর বলছেন এক ঈশ্বর বই আর কিছু নেই। কিন্তু কোথাও তিনি বলেননি যে ঈশ্বর এক। আবার বলছেন তিনি এক দুইয়ের পার, কার্যও নেই কারণও নেই। সৃষ্টি এলেই তবে কার্য কারণ হবে, তখন দিন হবে রাত হবে। এখানে যে অবস্থার বর্ণনা হচ্ছে এটা ঠিক সৃষ্টির পূর্বের। উপনিষদে একটি খুব প্রচলিত প্রার্থনা মন্ত্র আছে যা আমরা নিত্য আবৃত্তি করি – *ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়*।। – আমাকে সৎ অসৎ এর পারে নিয়ে চলো আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পারে নিয়ে চলো, আমাকে মৃত্যু থেকে অমৃতের পারে নিয়ে চলো। এটিতো উপনিষদের মন্ত্র, কিন্তু এখানেতো দ্বৈতের কথা বলা হচ্ছে, যারা কিছুই বুঝবে না তাদের জন্য বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো সৎ অসতের পার বললে কিছুই বুঝবে না, আলো ও অন্ধকারের পার বললে কিছু ধারণাই করতে পারবে না। তাই প্রাথমিক স্তরে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে? তখন এইখান থেকে শুরু করা হয় – হে ভগবান আমার মন্দ বুদ্ধি দূর করে শুভ বুদ্ধি দাও, হে ভগবান আমার পাপ বুদ্ধিকে দূর করে ধর্ম বুদ্ধি দাও। এরপরে সাধনা করে যখন এগিয়ে যায় তখন বলে – হে প্রভু, আমি যেন পাপ-পূণ্যের পারে যেতে পারে, তুমি আমাকে ধর্ম-অধর্মের পারে নিয়ে চল। এইভাবে আগে তম ও রজ গুণকে অতিক্রম করে সত্ত্বগুণকে ধরতে হবে, সত্ত্বগুণকে না ধরতে পারলে সাধু পুরুষ হওয়া যায় না। সাধু পুরুষ হয়ে গেলেই সব হবে না, এরপরে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সত্ত্ব, রজ ও তম তিনটে গুণকেই অতিক্রম করে যেতে হবে।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ – বলছেন দিন রাতের কথা ছেড়ে দাও সামান্যতম কিছুর আভাসও ছিল না, যাতে বোধ হবে কিছু আছে। স্বামীজী এর অনুবাদ করেছেন torch কিন্তু সঠিক শব্দ হবে indication, দিন ও রাতের যে ধারণা করেবে তারও কোন রকম আভাস ছিল না। একেই বলে কাব্য। প্রথমে বলছেন কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, এবার বলছেন তার কোন রকম আভাসও ছিল না। যে ঋষিই এই নাসাদীয়সূক্তম্‌কে ছন্দোবদ্ধ করেছেন তিনি সত্যিকারের বিরাট উচ্চ মাপের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

এই অবস্থাটাকে অব্যক্তও বলা যাবে না। অব্যক্ত বললেই ব্যক্ত ভাবটাও এসে পড়ে, কিন্তু এখানে যে অবস্থার কথা বলা হচ্ছে তা হল ব্যক্ত অব্যক্তের পারের অবস্থা। অব্যক্ত বলতে সব সময় প্রকৃতি বা মায়াকে বোঝায়, ভগবানকে কখনই অব্যক্ত বলা যায় না। মায়া সব কিছুকে ব্যক্ত করে কিন্তু নিজে অব্যক্ত।

ভগবান হচ্ছেন এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের পার। এগুলো হচ্ছে সাধনা সাপেক্ষ, শুধু শুনলে বা শাস্ত্র পড়লে এই জিনিষগুলিকে কখনই ধরা যাবে না। যখন Theory of Probability, আইজেনবার্গের Uncertainty Principle প্রথম বেরোল, আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীও ফালতু তত্ত্ব বলে Theory of Probability কে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তিনিও মেনে নিতে পারলেন না যে এটাও হতে পারে আবার ওটাও হতে পারে। আইজেনবার্গ নিজে যখন এই থিয়োরিকে ফরমুলেট করলেন, তাঁর নিজেরই মাথা ঘুরে গিয়েছিল, যখন এই থিয়োরিটা তিনি বার করলেন। তিনি নিজেই থিয়োরিটাকে দশ বছর চেপে রেখে দিয়েছিলেন। Uncertainty Principle বলছে A x B is not = B x A. এটাকে কেউ মানতে পারে? তাই তিনি দশ বছর চেপে রেখেছিলেন। সেই সময় খবর এল অঙ্কে Matrix Theory আছে যেখানে A x B is not = B x A হয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এইটা ছেপে দিলেন। এখন তো এই থিয়োরি ক্লাশ নাইন টেনে পড়ান হয়। ছাপা হয়ে যাওয়ার পর আইনস্টাইনের মত সর্বশ্রেষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী পর্যন্ত মানতে পারলেন না, তিনি বললেন যে আমরা কি বিজ্ঞানের কথা বলছি না আগড়ুম বাগড়ুম কিছু কথা বলছি। কারণ তখন পর্যন্ত ফিজিক্স জানত যে A leads to B, B leads to C, so A leads to C, কিন্তু এখন বেরিয়ে গেল A leads to B, B leads to C but A does not lead to C, অথচ আজকে মেট্রিক্স থিয়োরি, uncertainty principle ক্লাশ নাইন টেনে পড়ান হচ্ছে। যে জিনিষটা আইনস্টাইন রাজী হননি সেই জিনিষ এখন ক্লাশ এইটের ছেলেরা পড়ছে। কারণ ব্রেণ এখন তৈরী হয়ে গেছে।

এই জিনিষ গুলিকে ধারণা করার জন্য দরকার প্রচণ্ড রকমের একাগ্রতা, গভীর চিন্তন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর পবিত্রতা। আমাদের এগুলোর কোনটাই এখন হয়নি সেইজন্য শুনে বা পড়ে আমরা ধারণা করতে পারিনা। কথামৃতে ঠাকুরের অনেক কথা আছে যেগুলো ধারণা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ঠাকুর বলছেন তিনি এক দুইয়ের পার। এখন কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এক দুইয়ের পার বলতে কি বোঝায়, উত্তরই দিতে পারবে না।

মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোন জিনিষ যার উল্টোটাও হতে পারে তিনি সেটা নন। যখন অস্তিত্বের কথা আসবে তখন অনস্তিত্বের কথাও আসবে, তাই এখানে বলছে তিনি সৎও নন অসৎও নন, তিনি সৎ অসৎএর পারে। আছে আবার নেই এটাকে ধারণা করার জন্য বলেছেন একদিকে দিয়ে বলতে গেলে তিনি অব্যক্ত আরেক দিক দিয়ে গেলে বলতে হয় তিনি ব্যক্ত। অব্যক্তের 'অ' টাকে সরিয়ে দিলে এটা অব্যক্তও নয় আবার ব্যক্তও নয়। এগুলো শব্দের কোন খেলা নয়। এটাই হয়, এটা এই রকমই হয় আর যা এই সত্যটাকেই বলা হচ্ছে। যখন ধ্যানের গভীরে যাবে, যখন আমাদের আত্মানুভূতি হয়ে যাবে তখন পরিষ্কার এই সত্যটাই উন্মোচিত হয়ে যাবে। নাসাদীয়সূক্তম্ কোন সাদামাটা একটা বাংলা কবিতা নয়, আর মামুলি কবিতা হলে এইভাবে আমরা আলোচনাই করতাম না। কিন্তু এই কবিতাতে আধ্যাত্মিক সত্যের চরম তত্ত্ব গুলিকে শব্দ ও বাক্য দ্বারা বিন্যাস করা হয়েছে। ঠাকুরের কথায় আছে কাটায় হাত কেটে গেছে, দর্‌দর্ করে রক্ত ঝড়ছে আর বলছে আমার তো কিছু হয়নি। এই একই জিনিষের উল্লেখ পাই স্বামীজী যখন সেই কাহিনী বলছেন যেখানে আলেকজাণ্ডার একজন ঋষিকে ধরে বলছেন – তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাব, তুমি যদি আমার সাথে না যাও তাহলে তোমাকে হত্যা করে রেখে যাব। ঋষি বলছেন – তোমার জীবনে এর থেকে বড় মিথ্যা কথা তুমি কখন বলোনি। আমি আত্মা তুমি আমাকে মারবে কি করে? ঋষি ঐ অবস্থায় পৌঁছে গেছেন যেখানে তাঁর দেহটা আছে এই মাত্র। আলেকজাণ্ডার যদি বলত আমি তোমার দেহটাকে নাশ করে দেব, তাহলে ঋষি বলতেন হ্যাঁ বাপু তা তুমি পারবে, কিন্তু আমাকে কিভাবে মারবে, আমিতো আত্মা, আত্মাকে কেউ কখন কোন ভাবেই নাশ করতে পারে না। যাঁর এই আত্মানুভূতি হয়ে গেছে তাঁর শরীরের প্রতি সেই ভাবটাই হবে যে ভাবটা আমাদের জামা কাপড়ের প্রতি আছে। আমার জামাটা যদি কেউ ছিড়ে দেয় তাহলে আমার খারাপ লাগবে কিন্তু আমার দেহেরতো কিছু হবে না, কেননা জামাটা আলাদা আর আমার দেহটা আলাদা। ঠিক তেমনি যিনি আত্মজ্ঞানী তাঁর যদি দেহটা চলে যায় তাঁর কিছুই হবে না, দেহের সঙ্গে তাঁর একাত্ম বোধ যেদিন তাঁর আত্মানুভূতি হয়েছে সেদিনই নষ্ট হয়ে গেছে।

বেলুড় মঠে একজন মহারাজ ছিলেন তাঁর ক্যান্সার হয়েছিল। যেদিন তাঁর শরীর গেছে তার আগের দিন সবাই এসে ওনাকে বলছেন আপনার তো প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে, চলুন আপনাকে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাই। উনি অবাক হয়ে বলছেন – কষ্ট! কিসের কষ্ট! আমি সেই ব্রহ্ম, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা আমার কিসের কষ্ট। সবাই অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন। ক্যান্সারের ঐ মারাত্মক যন্ত্রণা কিন্তু কোন অনুভূতিই নেই। চিন্তা করা যায়! শরীর যাবার একদিন আগে এই কথা বলছেন – আমি সেই শুদ্ধাত্মা, আমি সেই ব্রহ্ম আমার কোথায় কষ্ট। শাস্ত্রের বাক্য মুর্ত কিভাবে হয় মহারাজকে ওই সময় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই দেখেছিলেন।

এই যে এখানে বলছেন *ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি,* যাঁদের আত্মানুভূতি হয় তাঁরা ঠিক এই জিনিষটাকেই স্পষ্ট দেখেন। কিন্তু আমরা তো বুঝতে পারব না, তাই হাজারটা উদাহরণ দিয়ে দিয়ে একটু ধারণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আচার্যের কাছে যা কিছুই শুনছি এগুলো হচ্ছে আচার্যের বাহ্যিক উত্তেজনার তরঙ্গগুলি তথ্য হয়ে আমাদের ভেতরে যাচ্ছে মাত্র, এতে আমাদের কোন অনুভূতিই হবে না, জ্ঞান যেটা হবে সেটা আমার ভেতর থেকেই হবে, বাইরে থেকে আসবে না। একটা জোক্‌কে যদি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় তাহলে সেটাকে আর জোক্ বলে গণ্য করা হয় না। শাস্ত্র হচ্ছে ঠিক তাই। বলাটা আচার্যের কর্তব্য কিন্তু বোঝার ব্যাপারটা শিষ্যের।

প্রকেতঃ শব্দের অর্থ নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি, প্রকেতঃ হচ্ছে কোন কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে, বা সূচনা করছে, ইংরাজীতে বলছে indication। এই indication কে দেখানোর জন্য এনারা সংস্কৃতে একটা শব্দকে খুব ব্যবহার করেন, তা হচ্ছে 'ইব', ইব মানে যেন, মত। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতা ভাষ্যেও ঠিক এই কথাটাই বলছেন – যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনি মানুষ রূপ ধারণ করে যেন জন্ম গ্রহণ করেন। একেবারে পরিষ্কার করে তাঁরা জিনিষগুলিকে বলতেন না। কারণ ভগবানের জন্মকে পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে তিনি জাগতের বস্তু হয়ে যাবেন। মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা বললে কি হয় আমরা যেমন কানে শুনছি চোখে দেখছি, ঠিক এইভাবে জিনিষটা হচ্ছে না, ঠাকুর বলছেন তখন বোধে বোধ হয়। বেদের কিছু ভাবকে যখন আলোচনা করা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল কেন বেদ বোঝা খুব কঠিণ। তার মধ্যে একটা বলা হয়েছিল, যে ভাষা বেদে ব্যবহার করা হয়েছে তা অনেক পুরনো ভাষা, আর সেই ভাষা আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেই অপ্রচলিত হয়ে গেছে, তার মানে আরও কত পুরনো এর ভাষা। পাঁচশ বছর আগে ব্যবহৃত ভাষার অনেক অর্থই আমরা ধরতে পারিনা, আর বেদের ভাষা আড়াই হাজার আগেই ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। সেইজন্য অনেক জায়গাতেই বোঝা যায়না ওনারা ঠিক কি বলতে চাইছেন। এর থেকেও বড় সমস্যা হচ্ছে, যে জিনিষটা ওনারা বলতে চাইছেন তকে মুখে কখন বলাই যায় না। সৃষ্টি তত্ত্ব, আত্মতত্ব, ঈশ্বরের স্বরূপ, মায়া এগুলো মুখে বলাই যায় না। যেটুকু তাঁরা যে ভাষাতে প্রকাশ করতে চাইছেন সেই ভাষাও আড়াই হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের মত সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে এই সব ঋষিদের কথাকে। তাই আমাদের সায়নাচার্যের মত কিছু পণ্ডিতদের ভাষ্যের উপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সায়নাচার্যকে আবার অনেকে মানেন না।

এখানে বলছেন যে সৃষ্টির আগের মুহূর্তে দিন আর রাতের কিছুরই বোধ নেই, ঘুণমাত্র যে বোধ হবে সেটাও ছিল না। যা কিছু দ্বন্দ্বমূলক সবটাকেই না করা হচ্ছে। যদি বলা হয় মৃত্যু ছিল না, তাহলে বলব অমৃত ছিল, দিন ছিল না, তাহলে রাত ছিল। না, কোনটাই ছিল না, মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না, আবার দিনও ছিল না রাতও ছিল না। পরিষ্কার করে বলছেন না যে দিন ছিল না রাতও ছিল না, বলছেন দিন ও রাতের কোন বোধ ছিল না। আমরা দিন ও রাত বুঝি কি করে? কতকগুলি লক্ষণ দেখে বুঝি যে এখন রাত বা দিন, কিন্তু এখানে বলছেন এই রকম কোন ধরণের লক্ষণই ছিল না যে বোঝা যাবে এটা রাত কিংবা দিন। এইটাই হচ্ছ প্রকেতঃ শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় মন্ত্রের পরের লাইনে বলছেন – *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস। আনীৎ অবাতং তৎ একম্ স্বধয়া* – এই লাইনটাতে পুরো নাসদীয়সূক্তের মূল বক্তব্যের কেন্দ্রীয় ভাবটাকে বলা হচ্ছে। যেন এই একটা বাক্যকে লেখার জন্যই পুরো নাসাদীয়সূক্তম্ রচিত হয়েছে। এই লাইনটা আর শেষে একটা লাইন আসবে যাতে নাসদীয়সূক্তমের মূল তত্ত্বকে তুলে আনা হয়েছে। এত গুরুত্বপূর্ণ এই লাইনটা যে পরের দিকে স্বামীজী যখন সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন বিশেষ করে যখন নিকোলা টেক্সলা বলে একজন বড় আমেরিকান বিজ্ঞানী, মূলতঃ তিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তার সাথে স্বামীজী এই সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। টেক্সলা স্বামীজীর আলোচনাতে প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়েছিলেন। যেখানে স্বামীজী বক্তৃতা দিতেন সেই জায়গাটা খুব ছোট ছিল, টেক্সলা কখনই ভেতরে গিয়ে বসতেন না, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পুরো বক্তৃতা শুনে বেরিয়ে যেতেন। পড়ে যখন স্বামীজীর সাথে আলাপ হয় তখন স্বামীজী তাঁকে বেদান্তে যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। টেক্সলা সেই আলোচনা শুনে খুব উৎসাহিত হয় বললেন 'পৃথিবীর যত ধর্মে যত সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বলা হয়েছে সবই গালগপ্প মনে হয় কিন্তু আপনি যে তত্ত্বটা সৃষ্টি সম্বন্ধে বললেন সেটাকে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত করা যায়। আপনি যেটা বলছেন সেটাকে আমি অঙ্কের মাধ্যমে প্রমাণিত করে দেব'।

পরবর্তি কালে টেক্সলা এই নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছিলেন, আর স্বামীজীও এর পরে বেশি দিন দেহে ছিলেন না, তাই টেক্সলা কতটা কি করতে পেরেছিল আমাদের কাছে সঠিক ভাবে জানা নেই। কিন্তু পরে আইনস্টাইন যখন $E = MC^2$ আনলেন, সেই সময় টেক্সলা বা স্বামীজীর সঙ্গে আইনস্টাইনের কোন রকমের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু দেখা যায় সবারই একই ধরণের চিন্তা এখানে এসে মিলিত হচ্ছে। স্বামীজী যেটা বলতে চাইছিলেন, টেক্সলা যাকে গণিতের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে চেয়েছিলেন, আইনস্টাইন যেটা দাঁড় করালেন, সবটাই একই ভাবের আবর্তের মধ্যে ঘুরছিল। আইনস্টাইনের থিয়োরি যখন এসেছিল সেই সময় স্বামীজী যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন এটা বেদান্তের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

এখানে যে তিনটে শব্দ আমরা পাচ্ছি 'আনীৎ', 'অবাতং' ও 'স্বধয়া', এই তিনটে শব্দকে দর্শনের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিতরা নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে দেবেন। আনীৎ আসছে আন্ ধাতু থেকে, মানে নিঃশ্বাস নেওয়া, অবাতং এর অর্থ হচ্ছে যার নিঃশ্বাস নেই, তাহলে 'আনীদবাতং' এর অর্থ হচ্ছে যার নিঃশ্বাস নেই সে নিঃশ্বাস নিল, মানে যে নিঃশ্বাস নিতেই পারেনা, সে নিল নিঃশ্বাস। 'স্বধা' এই শব্দটাও অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। স্বধা শব্দের নানা রকমের অর্থ করা যেতে পারে, প্রথমে বলা যায় প্রকৃতি, স্বধয়া হচ্ছে নিজের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতির অনুসারে। স্বধা শব্দের অর্থ মায়াও হতে পারে, স্বধয়া মানে নিজের মায়ার দরুণ। স্বধা আবার শক্তিকেও বোঝায়। স্বধয়া শব্দের অর্থ তিন রকমের পাচ্ছি – প্রকৃতি, মায়া ও শক্তি। প্রথমে বলেছিলেন তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, মৃত্যু ছিল না অমৃতও ছিল না, সেইখান থেকে এসে বলছেন তিনি একা ছিলেন তৎ একম্। তিনি একা কি ভাবে রয়েছেন? তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন না, তারপরেই বলছেন আনীত, তিনি নিঃশ্বাস নিলেন। কিভাবে নিঃশ্বাস নিলেন? স্বধয়া, যেহেতু এই স্বধয়ার তিন রকম অর্থ হতে পারে তাই বলা যায় তিনি নিজের প্রকৃতির দ্বারাই শ্বাস নিচ্ছেলেন, আবার মায়াতে মনে হচ্ছে তিনি যেন শ্বাস নিচ্ছেন, অথবা তিনি নিজের শক্তির দ্বারা নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন।

ভারতে যে কটি আধ্যাত্মিক দর্শন বেরিয়েছে সব এই একটা শব্দকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে। যখন স্বধয়াকে প্রকৃতি বলছে তখন সাংখ্য দর্শন এসে যাবে, সাংখ্য দর্শনের সাথে যোগদর্শনও এসে যাবে। যখন স্বধয়াকে মায়া অর্থে বলবে তখন বেদান্ত এবং বেদান্তের সঙ্গে জড়িত যত দর্শন হতে সব দর্শনকে বোঝাবে। আবার যখন স্বধয়ার অর্থ করবে শক্তি তখন তন্ত্রদর্শন এসে যাবে আর যে কোন ভক্তিমার্গ বিশেষ করে যেই ভক্তিতে শক্তিকে মানা হয়, সব দর্শন এসে যাবে। অধ্যাত্ম রামায়ণে বলা হচ্ছে সীতা হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি, এই ধরণের যাবতীয় শাস্ত্র যেখানে এইভাবে শক্তির স্থান করে দিচ্ছে সব শাস্ত্র মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে এই একটি কথার জন্য।

আমরা অনেক সময় ভাবি হিন্দুদের এত দর্শন কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। এর উত্তর এইখানে এসে পাওয়া যাবে। একটি মাত্র শব্দ তার অর্থ যেভাবে করা হয়ে সেই ভাবে একটা করে দর্শনের আলাদা একটা শাখা তৈরী হয়ে যাবে। যদি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈত থেকে তিন জন পণ্ডিতকে দাঁড় করিয়ে গীতার বা উপনিষদের একেকটা শ্লোক বা মন্ত্রকে বিশ্লেষণ করতে বলা হয় তখন দেখা যাবে প্রত্যেকেই যুক্তি দিয়ে অর্থ দিয়ে দেখিয়ে দেবেন যে এই শ্লোকটা তাঁর মতটাকেই প্রতিষ্ঠিত করছে।

এই নাসদীয়সূক্তমের এই লাইনটাকে স্বামীজী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে দেখা যাবে যে তিনি চতুর্থ আরেকটা তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে দিলেন, যদিও এটা মায়া তত্ত্বের খুব কাছাকাছি। বলছেন - তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই, তিনি আছেন আর তাঁর স্বভাব আছে, দ্বিতীয় আর কোন সত্তা এখানে নেই। পরের দিকে এসে স্বামীজী একটা তত্ত্বকে দাঁড় করালেন তাতে তিনি আকাশ আর প্রাণকে নিয়ে এলেন। এখানে যে কবিতাটাকে তিনি অনুবাদ করলেন সেখানে বললেন The one breathed windlessly। পরবর্তি কালে স্বামীজী যখন বক্তৃতায় তাঁর অভিমতকে ব্যক্ত করছিলেন সেখানে তিনি প্রায়ই নাসদীয়সূক্তমের এই লাইনটা উল্লেখ করেছেন। সচ্চিদানন্দ হচ্ছেন শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। এই যে শুদ্ধ চৈতন্য রয়েছেন, কোন একটা রহস্যময় নিয়মের কারণে, তাঁর মাঝখানে যেন একটা বিভাজন রেখা এসে যায়, রেখার এই পারে যেন পদার্থ ও শক্তির জন্ম হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে তখনও কিন্তু আইনস্টাইনের জড় আর শক্তি অভেদ এই তত্ত্ব আবিষ্কার হয়নি, অথচ স্বামীজী বার বার কিন্তু বলছেন জড় আর শক্তি এক, দুটোর মধ্যে কোন রকম পার্থক্য নেই। আসলে এটাই কিন্তু আমাদের প্রাচীন বৈদিক যুগের তত্ত্ব। এই জড়কেই আমাদের চিরাচরিত ভাষায় বলা হয় আকাশ, এই আকাশ আমাদের মাথার উপরে যে আকাশ দেখি সেই আকাশের কথা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে না। আকাশ হচ্ছে যা কিছু জড় পদার্থ আছে তার অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবস্থা। এই সূক্ষ্ম কণা সর্বত্রই আছে। যেখানেই আকাশ সেইখানেই বুঝতে হবে এই সূক্ষ্ম জড়কণা রয়েছে। যেখানেই space আছে সেখানেই আকাশ থাকবে, তাই আকাশ বলতে আমরা যে space বুঝি, এতে কোন ভুল নেই। কারণ এই যে particles আছে এটাকে কখন অনুবাদ করা হয় Space Particles কখন অনুবাদ করা হয় Ether Particles আবার এগুলোর সংশয় থেকে বাঁচার জন্য সোজা আকাশ বলে দেয়। তার কারণ আকাশ শব্দের এই ধরণের তত্ত্ব বা ধারণা যে হতে পারে এটা আর কোন দর্শনে নেই। বৈদিক ধারণায় আকাশকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় এটা না space না ঈথার। আকাশকে তাই আমরা আকাশ বলেই উল্লেখ করব যার অর্থ হচ্ছে জড়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনু আর যাবতীয় যা কিছু আছে সবই এই আকাশ অনু থেকেই সৃষ্টি হয়। এই আকাশ থেকে একটা অন্য আকার নিচ্ছে যেটা আগেরটা থেকে একটা স্থূল, তার থেকে আরেকটা হতে হতে সব শেষে আমরা এই জগতের যা কিছু দেখছি সব সৃষ্টি হয়েছে। যেখানেই space সেখানেই আকাশ আবার যেখানেই আকাশ সেখানেই space।

একটা বেলুনে যখন আমরা ফু দিয়ে বড় করতে থাকি তখন বেলুনটা আয়তনে বাড়তে থাকে। যদি জিজ্ঞেস করা হয় কোথায় বাড়তে থাকে বেলুনের ভেতরের আকাশটা? তার উত্তর হবে আকাশে। আকাশটা এখানে কিভাবে তৈরী হচ্ছে? বাতাস দিয়ে, বাতাস হচ্ছে air particles. কিন্তু ফোলান বেলুনটি আকাশের ফাঁকা জায়গার মধ্যেই সে ফুলেছে, এই আকাশের ক্ষেত্রে তা হয় না। একটা super space ছিল তার মধ্যে আরেকটা নতুন space তৈরী হয়েছে তা নয়। কিছুই ছিল না, যাই থাকুক এই মন দিয়ে সেটাকে ধরা যাবে না, কারণ ওটা মনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ঠিক এটাই আধুনিক ফিজিক্স বলছে। এখন ফিজিক্স বলছে একটা সময়ে এই আকাশের সৃষ্টি হয়েছিল, একই সময় আকাশ, সময় ও পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। আর এই তত্ত্বকেই নাসাদীয়সূক্তম্ বলতে চাইছে। কত সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এই আকাশ, কাল আর পদার্থের? ফিজিক্স বলছে এই সেকেণ্ডকে যদি একের পিঠে কোটি কোটি শূন্য লাগিয়ে দেওয়ার পর যে সংখ্যা হবে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যত সেকেণ্ড হবে সেই সময়টুকুর মধ্যে এই সৃষ্টি হয়েছে। এত দ্রুত পদ্ধতিতে হয়েছে যে তাকে ধারণা করা দূরে থাক, আমরা কল্পনাতেও আনতে পারব না।

যাই হোক, সৃষ্টির পরে তারপরে গোটা ব্রহ্মাণ্ড নিজেকে বিস্তার করতে থাকে। এখন ব্রহ্মাণ্ড যে বিস্তার হচ্ছে, কোথায় বিস্তার হচ্ছে, কিসে বিস্তার করছে? বিজ্ঞানীরা এর উত্তর জানে না। বিজ্ঞানীরা এখন অনেক হিসেব করে বলছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কি আছে আমরা কি করে বলব। আর বেদে অনেক কাল আগেই বলে দিয়েছে এটা আলোচনাই হয় না, কেউই বলতে পারবে না। এই প্রশ্ন তোলাই যাবে না। এই প্রশ্ন নিয়ে যদি তোমাকে চলতে হয় তাহলে তোমার জন্য এগুলো নয়, আর এর উত্তরও তুমি কোন দিন পাবে না।

স্বামীজী জড়কে আকাশ আর শক্তিকে প্রাণ বলে সম্বোধন করে বললেন এই প্রাণ বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হতে থাকল। আকাশ ও প্রাণ একই, এই দুটো পৃথক কোন কিছু নয়, যমজ ভাইয়ের মত। আকাশ ও প্রাণের একই সাথে উৎপত্তি হয়েছিল। উৎপত্তি হওয়ার পরে প্রাণ আকাশের উপরে আঘাত করতে থাকল, শক্তির ধর্মই এইটা। এইটাই বলছে আনীত অবাতং, নিঃশ্বাস ছাড়তে শুরু করল। কিসের উপরে? মানে আকাশ, আকাশের উপরে। এইটাকেই স্বামীজী বলছেন প্রাণ আকাশের উপরে আঘাত করতে শুরু করল। কোথা থেকে এল এই আকাশ ও প্রাণ? বলছে সেই চৈতন্য কোন এক প্রক্রিয়াতে এই আকাশ ও প্রাণে রূপান্তরিত হয়েছে। কি সেই প্রক্রিয়া? সেইটাই আমরা কেউ জানিনা। এইটাকেই আমাদের বেদের ঋষিরা স্বধয়া বলছেন। এটাকেই মায়া বলছে, এটাকেই কেউ প্রকৃতি আবার কেউ শক্তি বলছে। শক্তি, প্রকৃতি বা মায়া কার? সেই চৈতন্যেরই। সেই চৈতন্য তাঁর শক্তিতে এই আকাশ ও প্রাণের সৃষ্টি করে দিচ্ছে। সৃষ্টি হতেই প্রাণ আকাশের উপরে আঘাত হানতে শুরু করল আর তারপরেই এই জগতের সৃষ্টি হতে শুরু করে দিল। পদার্থ থাকলে সৃষ্টি হতে কত আর সময় লাগবে। এইটাই হচ্ছে সৃষ্টির ব্যাপারে ঋকবেদের বক্তব্য। তদেকং, তিনি একাই আছেন, এক ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। আর স্বধয়াকে যদি মায়া বলা হয় তাহলে এই যা কিছু দেখছি এগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারে কারণ এটা মায়া। আর যদি স্বধয়াকে প্রকৃতি বলেন, তাহলে এইটাই তাঁর স্বভাব।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে এসে ভগবান বলছেন – আমার দুই রকমের প্রকৃতি – পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি। গীতা নতুন কিছু বলছে না, বেদের এই তত্ত্বগুলিকেই বলা হচ্ছে। এই আকাশ ও প্রাণ স্বামীজীর খুব প্রিয় বিষয় ছিল। এই একটা লাইনের মাধ্যমে বেদ সমস্ত সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলে দিল। কেউ যদি বলে হিন্দু ধর্মের সৃষ্টির সম্বন্ধে কি বিশ্লেষণ আছে? তখন এই লাইনটা বলে দিলেই হবে – *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং*, বায়ু ব্যতিরেকেও তিনি প্রাণক্রিয়া করছিলেন, আর তিনি নিজের মায়া বা প্রকৃতি বা শক্তির সাথে অভিন্ন হয়ে এই কার্য করছিলেন। এর বাইরে আর কোন প্রশ্ন করা যায় না। এই আপেক্ষিক জগতের মধ্যে থেকে অনন্তের চিন্তা করাই যায় না। ঠাকুর যেমন বলছেন – এক সের ঘটিতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে। আমাদের তো এই এতটুকু বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি দিয়ে আজকে ডালের সঙ্গে কি ভাজা খাব এই চিন্তাতেই আমাদের বুদ্ধি খরচ হয়ে যায় এরপর আবার সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্যকে নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। আমাদের যতটুকু বুদ্ধি তাই দিয়েই এই স্বধয়াকে বিচার করব, যদি বলি সবই ঠাকুরের লীলা তখন স্বধয়া মানে হয়ে যাচ্ছে শক্তি, আবার যদি তাঁর লীলাকে উড়িয়ে দিয়ে বলি সব মায়া, সব ফালতু, মিথ্যা, তখন হয়ে যাচ্ছে মায়া। আবার যদি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বিচার করে মীমাংসা করতে যাই তখন আমাদের সাংখ্যের প্রকৃতি তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হবে। তখন আবার প্রকৃতিকে বলবে ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্ব, রজ ও তম। সেই আকাশের উপরে প্রাণ আঘাত করতে সেখান থেকে বেরোল মহৎ, মহৎ থেকে এল অহঙ্কার, সেই অহঙ্কার থেকে বেরোবে সূক্ষ্ম তন্মাত্রা, সূক্ষ্ম তন্মাত্রা থেকে বেরোবে স্থূলভূত, এই স্থূলভূতের আবার পরস্পরে মিশ্রণ হতে থাকবে, মিশ্রণ হতে হতে ইলেক্ট্রন প্রোটনাদির সৃষ্টি হবে। সেইজন্য সাংখ্যবাদীদের কাছে সৃষ্টিটা মিথ্যা নয় এটা হচ্ছে বাস্তব। ফিজিক্সের থিয়োরি গুলিও সাংখ্যযোগে খাপ খেয়ে যাবে কিন্তু একটা অবস্থার পর ফিজিক্স থেমে যাবে কিন্তু সাংখ্য ও যোগ থেমে থাকবে না, সে আরো এগিয়ে এগিয়ে যাবে।

এই যে *তদেকং* বলছে, *একম্* বলা হচ্ছে মানে তিনি একাই ছিলেন, কাকে নির্দেশ করা বলা হচ্ছে তিনি একাই ছিলেন? তার আগে বলা হয়েছিল আনীদবাতং, নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন না। এতক্ষণ ধরে আমরা যত আলোচনা করে এসেছি সব কিছু মাথায় রেখে বলা যেতে পারে এখানে এই একটা লাইনে এসে পুরো ব্যাপারটাকে সাংখ্যের প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আমরা এই *একম্*কে পুরো ব্রহ্ম, মায়া ও জীবজগৎ বলছি বা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শক্তি ও জগতের ব্যাখ্যা করলাম, ঠিক তেমনি *একম্*কে চৈতন্য না বলে সব ব্যাপারটাকে প্রকৃতি বলে দিলাম। *তদেকং*, সে একা, কে একা? প্রকৃতি। *অবাতং* নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, *আনীদ* নিঃশ্বাস নিল, নড়ে চড়ে উঠল। এখন কেন প্রকৃতি নড়ে চড়ে উঠল সেটা অন্য জায়গার কথা। আমাদের যে ছয়টি দর্শন আছে তার মধ্যে সাংখ্য হচ্ছে অন্যতম, সাংখ্যকে সমস্ত দর্শনের জননী বলা যেতে পারে।

সাংখ্য দর্শনের মূল বক্তব্যটা সংক্ষেপে হচ্ছে, সাংখ্য মতে পুরুষ আছেন, এই পুরুষ আমাদের নারী-পুরুষের পুরুষ নয়, চৈতন্য স্বরূপকে পুরুষ বলা হচ্ছে। সাংখ্যে পুরুষ শব্দ যখনই আসবে তখন আমাদের মধ্যে যে আত্মা বা চৈতন্য আছেন অথবা বিরাট যে ঈশ্বর বা ভগবান রয়েছেন তাঁর কথা বলা হচ্ছে। সাংখ্যের পুরুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় সৃষ্টির ব্যাপারে এর কোন মাথা ব্যাথা নেই। ঠাকুর সাংখ্যের এই পুরুষ তত্ত্বকে বোঝাবার জন্য খুব সুন্দর করে বলছেন – বিয়ে বাড়িতে গিন্নি সব কাজ করে যাচ্ছেন, যে পুরুষ বা বাড়ির কর্তাটি আছেন সে বসে বসে শুধু ভুরুর ভুরুর করে তামাক টেনে যাচ্ছেন, আর গিন্নি মাঝে মাঝে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে কর্তাকে সব খবর দিয়ে যাচ্ছে। সাংখ্যের পুরুষও কোন কাজ করে না। তাহলে কে কাজ করছে? সৃষ্টিতে প্রকৃতিই সব। এই প্রকৃতি হচ্ছে আবার জড়, তার আবার নড়াচড়া করার কোন ক্ষমতা নেই, চুপচাপ পড়ে থাকবে। কিন্তু হঠাৎ পুরুষ যখন এই জড় প্রকৃতি কাছে চলে আসে, যদিও প্রশ্ন করা হয় যে, পুরুষ আসে কি করে, কারণ পুরুষতো নড়বে চড়বে না, তা যেভাবেই হোক প্রকৃতির কাছে পুরুষ এলেই জড় প্রকৃতি নড়ে চড়ে ওঠে।

মনে করা যেতে পারে বাচ্চারা যে গুলি খেলে, সেই রকম অনেক গুলিকে পর পর সাজিয়ে জড় করে রাখা হয়েছে। কেউ একটা ফুঁ মারলেই গুলিগুলো নড়ে যাবে, যেমনি নড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে গুলিগুলো লাফাতে লাফাতে এদিক ওদিক সারা জায়গায় ছড়িয়ে যাবে। প্রকৃতিতেও এইভাবে একটার পর একটা বিবর্তন হতে থাকে। এই যে পুরুষ যে নির্বিকার ছিল সে এখন প্রকৃতির এই খেলা দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায় – কি সুন্দর আলো, কি সুন্দর বাতাস, কি সুন্দর রঙ। এইভাবে পুরুষ প্রকৃতির খেলা দেখতে থাকে আর প্রকৃতিও পুরুষকে যত রকমের খেলা দেখানোর আছে সেও নানা খেলা দেখাতে থাকে। তারপর যখন পুরুষ বলে আমার আর খেলা দেখতে ইচ্ছে করছে না, আমার কিছুতেই কোন প্রয়োজন নেই, তখন প্রকৃতি পুরুষকে ছেড়ে দেয়, প্রকৃতি আবার জড় হয়ে শুয়ে পড়ে। সাংখ্য মতে এই হচ্ছে সৃষ্টির ব্যাখ্যা। এই যে এখানে বলছে *আনীদবাতং স্বধয়া*, মানে সে এখন নিজের প্রকৃতিতে পড়ে আছে। *অবাতং* নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, জড় হয়ে পড়ে আছে, *আনীদ*, হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে নড়ে চড়ে উঠল, যে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল না সে নিঃশ্বাস নিয়ে নিল। মানে সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এই একটা লাইনের অর্দ্ধাংশ ভারতের সমস্ত দর্শনের চাবিকাঠি, শুধু সে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে আর সেই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে বলে দেবে সে কোন্ দর্শনের কথা বলতে চাইছে। যে কোন দর্শনকে দাঁড় করাতে গেলে সৃষ্টির তত্ত্বকে তার ব্যাখ্যা করতেই হবে। আর সৃষ্টির কথা বলতে গেলে '*আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং*' এই বাক্যটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রথম কথা মনে রাখতে হবে দুটো আলাদা সত্তা নেই, প্রথমে দুই আছে বলা যাবে না। *স্বধয়া তদেকং*, নিজে থেকেই হবে ওর বাইরে থেকে কিছু হবে না, বাইরে থেকে কেউ এসে মনে করিয়ে দিল আর নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করবে, তা কখন হবে না। আকাশ ও প্রাণকে থাকতে হবে অথচ কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটাই হচ্ছে একের খেলা। ভগবান এসে মাটির ঢেলা দিয়ে মানুষ তৈরী করলেন মানে ভগবান ও মাটি এই দুটো আলাদা জিনিষ থাকছে, এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের কল্পনা, অবশ্য কোন কোন ধর্মে সৃষ্টি এইভাবেই হয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে এই ধরণের তত্ত্ব কখনই গ্রাহ্য হবে না। তাহলে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এরা কি করে

ব্যাখ্যা করছে? এরা বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করে দেবে। কিন্তু এটাই হচ্ছে নাসদীয়সূক্তমের সৃষ্টির ব্যাপারে জটিল তত্ত্বের সংজ্ঞা, বিশেষ করে আমরা যে সৃষ্টি তত্ত্বের কথা আলোচনা করছি তার মূল বক্তব্যই হচ্ছে এইটা – *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং*।

এই লাইনটা একাধারে বলে দিচ্ছে প্রকৃতি একটার পর একটা কিভাবে নিজেকে বিস্তার করছে, আবার বলে দিচ্ছে ব্রহ্ম তাঁর মায়াকে আশ্রয় করে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করছে, এই সৃষ্টিকে আমরা সত্য বলেও মনে করতে পারি আবার মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দিতে পারি তাতে কিছু যায় আসে না। আবার এই লাইনটাকেই শিব আর শক্তির খেলা বলে গ্রহণ করতে পারি। যেভাবেই সৃষ্টিকে নিই না কেন এই *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং* এই তিনটে শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যেতে পারে।

তারপরেই বলা হচ্ছে *তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস*, মানে এই *তদেকং* মানে তিনি ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই একের পারে আর কোন যে সত্তা থাকতে পারে এই তত্ত্বকে এখানে সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হল। যদি শুধু শক্তিকেও নিই তাহলেও কিন্তু শিব এসে যাবে আর ভগবান শিব আর তাঁর শক্তি আলাদা কিছু নয়। ঠাকুর বলছেন – অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, দুধ আর তার ধবলত্ব এরা কেউ আলাদা নয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ, যাদের কাছে দর্শনের তত্ত্ব দুর্বোধ্য মনে হয়, তারা বলেন শিব আছেন আর তাঁর শক্তি আছে, এঁরা দুজনে মিলে সৃষ্টির খেলা শুরু করে দেন। কিন্তু শিব আর শক্তি অভেদ, তন্ত্রেও বলছে সচ্চিদানন্দেকম্, সেই সচ্চিদানন্দই আছেন।

সায়নাচার্য ছিলেন ঘোর অদ্বৈতবাদী, এইখানে এসে তিনি সাংখ্য মতকে তীব্র আক্রমণ করে বলছেন – সাংখ্য বলে কোন দর্শন হতেই পারে না। তিনি বলছেন – সৃষ্টির আগে নিজেকে যে আশ্রয় করে আছে কিন্তু এখানে প্রকৃতি কাকে আশ্রয় করে আছে? কাউকেই প্রকৃতি আশ্রয় করে নেই, তাই সাংখ্য দর্শন বলে দর্শন হতেই পারে না। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা এর উত্তরে বলে – সে নিজেকে আশ্রয় করে আছে আকাশ ও প্রাণ পরস্পর আশ্রয় করে আছে, সমস্ত কিছুই প্রকৃতিকেই আশ্রয় করে আছে।

বিজ্ঞান যখন সৃষ্টির কথা বলে তখন তারা বিগব্যাং আর ব্ল্যাকহোলের কথা বলে। বিগব্যাং হচ্ছে মহাজাগতিক বিস্ফোরণের পর সৃষ্টির বিস্তার, আর ব্ল্যাকহোল হচ্ছে যখন সৃষ্টি প্রলয়ের পর সঙ্কুচিত হতে হতে একটা পয়েন্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বিগব্যাং এর প্রবক্তারা এই তত্ত্বটাকে গাণিতিক নিয়মে হিসেব করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন সঙ্কুচিত হতে থাকে তখন এনার্জি তাকে ধরে থাকে, আর প্রত্যেক পদার্থ একে অপরকে টানে, যখন টানতে থাকে তখন ছোট হতে থাকে। ছোট হতে হতে একটা বিন্দুর মত আকৃতিতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হয়ে যায়, কারণ পদার্থ এত চাপতে থাকে যার ফলে এত ঘনত্ব বেড়ে যায় যে কল্পনাই করা যায় না, আলোও সেখান থেকে বেরোতে পারে না। এরই বিভিন্ন অবস্থায় অনেক রকম নাম হয়ে থাকে, কখন হোয়াইট স্টার, কখন রেড স্টার, কখন ব্ল্যাকহোল ইত্যাদি। এখন একটা জিনিষের উপর যত চাপ পড়বে তত তার তাপ মাত্রা বাড়তে থাকবে। এইভাবে তাপমান একটা অবস্থা পর্যন্ত সহ্য করবে তারপরে সে বুম্ করে ফেটে পড়বে। যখন ফাটছে তখন এটাকে বলছে বিগব্যাং। তারপর বিস্তার হতে হতে যখন এনার্জি শেষ হয়ে যাবে তখন আবার সঙ্কুচিত হতে থাকে। সঙ্কুচিত হতে হতে যখন ব্রহ্মাণ্ড যখন একটা বিন্দুর আকার ধারণ করছে তখন দূরত্বের পরিমাপ শূন্য হয়ে যায়। দূরত্ব যখন শূন্য হয়ে যায় তখন তার রেজাল্ট হয়ে যায় অনন্ত। সেইজন্য বিজ্ঞানীরা বলে একটা সীমার পর কি হচ্ছে আমরা বলতে পারব না। ফিজিক্সে এর নাম হচ্ছে পয়েন্ট অফ সিঙ্গুলারিটি। এই পয়েন্টের আগে কি হচ্ছে বিজ্ঞান বলতে পারেনা। ঠিক এই কথাই ঋকবেদের এই নাসদীয়সূক্তমের শেষের দিকে বলছে – *যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ*। যিনি অধ্যক্ষ, অর্থাৎ ভগবান তিনিও এই সৃষ্টির কার্য জানেন কি জানেন না আমাদের জানা নেই। ঋষিরাও এই কথা বলছেন, কারণ যা আছে সেটা মুখে বলা যাবে না। বিজ্ঞানীর কেন বলতে পারছে না? কারণ সমস্ত গাণিতিক নিয়ম, ফিজিক্সের নিয়ম, নিউটনের থিয়োরি,

আইনস্টাইনের থিয়োরি, কোয়ন্টাম থিয়োরি সব এখানে এসে হারিয়ে যাচ্ছে, ভেঙ্গে পড়ছে। তাই বলে কি আমরা বলতে পারি যে বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম অযৌক্তিক যেহেতু এদের কোন নিয়মই এখানে এসে দাঁড়াতে পারছে না। কখনই তা বলতে পারব না। কারণ সবারই একটা সীমা আছে, এদের সবারই সীমিত ক্ষমতা। ঐ ক্ষমতার বাইরে এরা কখনই যেতে পারেনা।

সংস্কৃতে মেধাকে ব্যাখ্যা করা হয় গ্রহণ, ধারণম্ ও সামর্থম্ এই তিনটে দিয়ে। মেধাবী পুরুষ কে? যিনি একটা জিনিষকে গ্রহণ করতে পারেন, শুধু গ্রহণ করলেই হবে না, তাকে ধারণা করতে পারতে হবে। এই সৃষ্টি তত্ত্বের যাবতীয় যত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এগুলিকে যে গ্রহণ করে ধারণা করতে পারছেন তিনি মেধাবী, যদি মনেও রাখতে পারছেন তাহলে তিনি আরও উচ্চতম মেধাবী। মেধা মানেই তাই। কিন্তু আমাদের মেধা শক্তি খুবই সামান্য, তাই আমাদের শুধু এখন শুনেই রাখতে হবে।

সৃষ্টির সময় কি ছিল সেটা বলবে কে? কারণ সেটাকে দেখার জন্য তখন তো সেখানে কেউ ছিল না। একটা অবস্থার পর আমাদের মন বুদ্ধি কোন কাজ করবে না, যেখানে এসে বিজ্ঞানের সব থিয়োরি, নিয়ম ভেঙ্গে যায়। এই জায়গাটাকেই বলছেন তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, তখন দিনও ছিল না রাতও ছিল না। কিন্তু একটা কিছু ছিল, তাই *তদেকম্* বলছেন, একটা কিছু ছিল না বললে বলতে হবে শূন্য ছিল, আর শূন্য থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে। এই যে এখানে এক বলছে সেই এক কিন্তু একজন সত্তা বলে বলা হচ্ছে না, এই এক সৎ ও অসতের পারের অবস্থাতে অবস্থান করেছিলেন। যেই মুহূর্তে তাকে সৎ বলব তখন আর এই জগতের আধ্যাত্মিক সত্তা থাকবে না। তখন এই জগৎ হয়ে যাবে পদার্থ সর্বস্ব ব্রহ্মাণ্ড, যেটা বিজ্ঞান সব সময় বলছে। যদি বলি তিনি অসৎ অবস্থাতে অবস্থান করেছিলেন তাহলে তখন বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এসে যাবে। তখন বলতে হবে শূন্য থেকে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে, যেটাকে আমাদের হিন্দু দর্শন কখনই সমর্থন করবে না, কারণ শূন্য থেকে কিছুই হতে পারেনা, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এইটাই আমাদের হিন্দুধর্মের স্বীকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব। যদিও খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্ম বলে যে ভগবান সৃষ্টি করলেন কিন্ত এই ধর্মের যারা অতিন্দ্রীয়বাদী সাধক তারাও কিন্তু সৃষ্টি তত্ত্ব বলার সময় এই ভাষাতেই কথা বলেন। আবার যারা রাজযোগের সাধন করেন তারাও একটা অবস্থায় দেখেন মন কিভাবে নিজেকে পরিষ্কার আলাদা করে নিতে পারে। স্থূল ভূত থেকে সূক্ষ্ম ভূত সেখান থেকে ক্ষুদ্র মন আর বিশ্ব মনের যে পার্থক্য সেটাকে স্পষ্ট দেখতে পান। সেখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পায় যে এক বিরাট পুরুষই একমাত্র আছেন। এটা যে কোন মনের কল্পনাতে দেখেন তা নয়, পরিষ্কার ও স্পষ্টত তারা দেখতে পান। কিন্তু যখন ভাষায় একে বর্ণনা করতে যান তখন আর তারা বর্ণনা করতে পারেন না। তার ফলে মহম্মদ এক রকম বলছেন যিশু আরেক রকম বলছেন আবার শ্রীরামকৃষ্ণ আরেক রকম ভাবে বলছেন। কিন্তু খুব গভীরে গিয়ে যদি বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এনারা সবাই সেই একই জিনিষকে বোঝাতে চাইছেন। সে *তদেকম্*কে যদি বলে দেয় এইটাই ছিল তখন আর সেটা হিন্দুধর্ম থাকবে না, গোঁড়া বৈষ্ণব হয়ে যাবে অথবা গোঁড়া ইসলাম ধর্ম হয়ে যাবে। কিন্তু এই এককে আমরা নির্গুণ ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম বলতে পারি আবার জড় প্রকৃতি বলতেও পারি। আমি কি ধরণের মনোভাব নেব সেইভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। সব থেকে বড় কথা কি ছিল মুখে বলা যায় না। বলে, বোবাকে যদি মিষ্টি খাইয়ে জিজ্ঞেস করা হয় কিহে কেমন মিষ্টি লাগছে, তখন সে আকার ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইবে, কেননা মুখ দিয়ে তার কথা বেরোবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এসে আমরা এই জিনিষকে সত্যি সত্যি দেখতে পাই। তিনি ভক্তদের বলছেন – আজ তোদের আমি সব ফাঁস করে দেব। কিন্তু তারপরেই বলছেন – আমার মুখ যেন কে চেপে দিচ্ছে, বলতে দিচ্ছে না।

অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমস্এ পোল ভোল্ট নামে একটা খেলা আছে যেখানে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসে একটা উঁচু বাধাকে অতিক্রম করতে হয়। এখানে লম্বা লাঠিটা না থাকলে অত উঁচু বাধাকে সে অতিক্রম করতে পারবে না। আবার শেষ মুহূর্তে যদি লাঠিটাকে সে না ছেড়ে দেয় তাহলেও কিন্তু বাধাটাকে ডিঙোতে পারবে না। মন আর ঈশ্বরের মধ্যেও ঠিক এই সম্পর্ক। মন হচ্ছে লাঠির মত আর

ভগবান হচ্ছেন এই মায়া রেখার পারে। মনের সাহায্যে আমরা দৌড় মারছি ঐ মায়ার দড়িকে অতিক্রম করতে। মন যখন সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন আপনার সময় হয়ে গেছে লাফ মারার, কিন্তু তখনও যদি মনকে ধরে রাখি তাহলে আমরা এই মায়ার জগতেই থেকে যাব। লাঠি যদি ছেড়ে না দেয় সে ঐ দড়ির বাধাটাকে কোন দিন অতিক্রম করতে পারবে না।

আকাশের দিকে তাক করে যদি একটা গুলি ছুড়ি তাহলে কিছু দূর গিয়ে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে। কিন্তু যদি এসকেপ ভেলোসিটি, মানে প্রতি সেকেণ্ডে সাত কিলোমিটার গতিতে রকেট ছাড়া হয় তাহলেই সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করতে পারবে। যে রকেটগুলিকে চাঁদে পাঠানো হয় সেগুলিকে মোটামুটি প্রতি সেকেণ্ডে এগারো কিলো মিটার গতিতে ছাড়া হয়। যদি সাত কিলো মিটারের সামান্য একটু কম থাকে তাহলে রকেট ঘুরে আবার পৃথিবীতে চলে আসবে। মনকে ধরে রেখে আমরা যতই সাধনা করি না কেন, আমরা সেই মায়ার রাজ্যেই ফেরত চলে আসব। এর সব থেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন অদ্বৈত সাধনা করছিলেন তখন ঘুরে ঘুরে তাঁর সামনে মা কালী এসে যাচ্ছেন। কারণ মা কালী মায়ার রাজ্যে মনের মধ্যে গেঁথে আছে, শুধু মা কালীই নন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম যাই বলুন সব হচ্ছে মনের জগতের রাজা। যদি এই মনকেও অতিক্রম করতে হয় তাহলে মা কালীকেও জ্ঞান অসি দিয়ে খণ্ডিত করে দিতে হবে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে এসব জিনিষ ধারণা করা খুব কঠিন।

এর পরে আরও এক জটিল তত্ত্ব ঢুকে যাচ্ছেন। তৃতীয় মন্ত্রে বলছেন – ***তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মাহিনাজায়তৈকম্।।*** সৃষ্টির ব্যাপারে যা কিছু হতে পারে সব বলছেন। *তম আসীত্তমসা* – তখন অন্ধকার ছিল। অন্ধকার কোথায় ছিল? ঐ অন্ধকারের মধ্যেই ছিল। স্বামীজী বলছেন এই হচ্ছে সত্যিকারের কাব্য। তিনি এটাকে অনুবাদ করছেন – At first there was only darkness wrapped in darkness, মানে অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা, এমন অন্ধকার যে মনে হয় অন্ধকার অন্ধকারকে ঢেকে দিয়েছে। অন্ধকারের আমরা অনেক রকম বিশেষণ প্রয়োগ করি, ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার, কালো অন্ধকার, আলকাতরার মত অন্ধকার লেপে দিয়েছে। কালিদাস বলছেন সূচীভেদ্য অন্ধকার, এমন ঘন অন্ধকার যে ছুঁচ দিয়ে তাকে ছিদ্র করা যায় না। ঋকবেদ বলছে – এমন অন্ধকার যেন অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা। যদি কোন ভাবে অন্ধকারের একটা আস্তরণকে তুলে দেওয়া যেতে পারে তাহলে সেই আবার অন্ধকারই চলে আসবে। ঐ আস্তরণটাকে যদি তুলে দেওয়া যায় তাহলেও আবার অন্ধকার। এই রকম কত দূর পর্যন্ত অন্ধকার বিস্তৃত হয়ে আছে? শেষ পর্যন্ত। *তমঃ আসীত্তমসা অগ্রে*, প্রথমে কি ছিল? তমসা, অন্ধকারই ছিল। আর *অপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং* – পুরো সৃষ্টি যেন জল থেকে এসেছে। এই সলিল শব্দ দ্বারা এনারা ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন এটা বলা মুশকিল। স্বামীজী এটাকে অনুবাদ করছেন All these was only un-illumined water, এখানেও বলতে চাইছেন সৃষ্টি যেন জল থেকে এসেছে। গ্রীক ফিলজফিতেও এই ধরণের বিশ্বাস দেখা যাবে। সেখানেও তারা বিশ্বাস করে যে সমস্ত সৃষ্টি জল থেকে এসেছে। ভারতেও এই মতটা চলে এসেছে যে সব কিছু জল থেকেই এসেছে, আমরাও সমুদ্রের প্রাণী ছিলাম। সেইজন্য আমাদের lungs এ জল দরকার, lungs এ যত পরিমাণ জলের প্রয়োজন তার থেকে একটু জল যদি কম থাকে তাহলেই আমাদের গলা খুশ খুশ করবে আর কাশি হতে থাকবে। এটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আমরা সবাই হলাম জলের প্রাণী। সমস্ত প্রাণীরা কোন এক সময়ে জল থেকে ডাঙায় চলে এসেছে। এইজন্য যে কোন প্রাণীর মধ্যে জলীয় পদার্থ বেশি থাকে। আমাদের সবারই উৎপত্তি সমুদ্রে। এগুলো আমরা ইদানিং কালে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে জানতে পারছি, আগেকার দিনের লোকেরা এত খবর জানতেন না। কিন্তু বৈদিক ঋষিরা প্রথম থেকেই বলছেন যে প্রথম যে সৃষ্টির জল সেখান থেকে, primordial water থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে, এই primordial water ঠিক কি বলতে চাইছে আমাদের পক্ষে এখন বলা খুব মুশকিল। পরের দিকে পৌরাণিক আখ্যায়িকার মাধ্যমে এই প্রথম জলকেই বলছেন ক্ষীর সাগরে বিষ্ণু শেষ নাগের উপরে শুয়ে আছেন, সেইখান থেকে সৃষ্টি এসেছে। এই cosmic water এর ধারণা সমস্ত হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতেই উল্লেখ করা হয়েছে। যখনই সৃষ্টির

কথা আসবে তখনই এই cosmic water এর কথা এনারা বলবেন। এখানে বলছেন – এই cosmic water ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখানে আমরা দুটো তত্ত্ব পাচ্ছি – একটা হচ্ছে সৃষ্টি এসেছে cosmic water থেকে আর সৃষ্টি এসেছে অন্ধকার থেকে।

কোন এক গভীর রাতে এক অজানা অচেনা জায়গায় আমরা পৌঁছেছি। সেখানে কি আছে আমরা বুঝতে পারছি না, কেননা পুরো জায়গাটা অন্ধকারে ঢাকা। যখন ভোরের আলো আস্তে আস্তে চোখ মেলতে থাকল তখন যেন সব কিছু জেগে উঠল। তখন মনে হয় যেন এই সব কিছু অন্ধকারের গর্ভ থেকে জন্ম নিল। এর মানে সব জিনিষ আগেই ছিল, নতুন কিছু আসেনি। রাত্রের অন্ধকারে এই সব কিছু যেন এক হয়ে ছিল, যেমনি আলো ফুটতে থাকল, যেগুলো অপ্রকেত ছিল সেই সব জিনিষ প্রকেত হয়ে গেল। অপ্রকেতঃ মানে তখন কোন বহুত্বের চিহ্ন ছিল, সব অন্ধকারে এক হয়ে ছিল। ঠাকুর বলছেন – পায়রাকে দেখলে মনে হবে কিছু নেই, কিন্তু পায়রার গলায় হাত দিলে বোঝা যায় গমের দানায় ভর্তি হয়ে গিজ্‌গিজ্‌ করছে। এই অন্ধকারের মধ্যে সব যেন একত্বের ভাব নিয়ে অবস্থান করছে, যেমনি এটাকে নাড়াচড়া করতে যাব তখনই দেখা যাবে যে আরে এর মধ্যেতো অনেক কিছু রয়েছে। কোথায় ছিল এই সব কিছু? কাব্যের ভাষায় তখন আমরা বলি – অন্ধকার জন্ম দিল নানা জীবের। এখানে যে বলছে *তমসা গূঢ়মগ্রে*, এটা এই ভাবটাকেই ব্যক্ত করছে, আর এটা কোন রাত্রের অন্ধকারের কথা বলছে না, এখানে মহাজাগতিক অন্ধকারের কথা বলছে। সেই মহাজাগতিক অন্ধকার যেন এই সব কিছুর জন্ম দিচ্ছে।

তারপরের লাইনে বলছেন – *তুচ্ছ্যেনাভ্যপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মাহিনাজায়তৈকম্*। প্রথমে বলেছিল *নাসদাসীন্নো সদাসীৎ*, সেখান থেকে এসে গেছে একে। কিছুই ছিল না, কিন্তু এখন সেখানে এক এসে গেল। এই এক ছাড়া জগতে আর কিছু নেই। বৈদিক ঋষিরা লক্ষ্য করেছিলেন পাখিরা ডিমে তা দিলে ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে, আসলে ডিমে তা দেওয়া মানে ডিমের উপরে পাখি তার শরীরের উত্তাপ দিতে থাকে। ঋষিরা এই প্রক্রিয়াটাকে গ্রহণ করে বললেন সেই হিরণ্যগর্ভ থেকে এক বেরিয়ে এলেন। কিভাবে হিরণ্যগর্ভ থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে এলো? তাপের শক্তিতে, কোথা থেকে তাপ এল? বলছেন তপসা, তপস্যার মাধ্যমে তাপ প্রবাহ তৈরী হল। *তপসার* অর্থ এখানে আবার দুই রকম ভাবে ব্যবহার করা যায়। *তপসা* হচ্ছে তাপ, মহাজাগতিক তাপ। আমরা এখন বিগব্যাং এর কথা বলছি, তখনকার ঋষিরা এই সব থিয়োরি জানতেন না। ফিজিক্সও বলছে তাপের মাধ্যমে বিগব্যাং প্রক্রিয়ায় এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। তপসার অর্থ তপস্যাকেও বোঝায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছেন '*স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা*'। তপস্যা হচ্ছে, যখন কেউ একটা ব্রত ধারণ করে নিয়ে সেটাতেই সমস্ত মন প্রাণ ইন্দ্রিয় শরীরকে উৎসর্গ করে দিচ্ছে তখন শরীরে একটা তাপ সৃষ্টি হয়। একাদশী ব্রত করছে, খাচ্ছে না, একটা কিছুতে মনটাকে একাগ্র করে দিচ্ছে সেই দিন, তখন শরীর থেকে তাপ বেরোতে থাকবে। ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়েছে, কিছু দিন ধরে করতে করতে শরীর থেকে তাপ বেরোবে। দিনে তিন চার ঘন্টা আসনে বসে জপ ধ্যান করছে অনেক দিন ধরে, তাপ জন্মাবে। তপস্যার মাধ্যমে এই তাপ যখন সৃষ্টি হয় তখন এই তাপ থেকে অনেক কিছুর জন্ম হতে পারে। তপস্যা হচ্ছে একটা জিনিষকে নিয়ে, একটা ভাবকে নিয়ে তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। তপস্যার এতো শক্তি যে কেউ যদি ঠিক করে নেয় যে আমি প্রত্যেক দিন মন্দিরে দুই ঘন্টা করে আসনে বসে জপ করব আর আমি এই এই ফল চাই, এখন সে যদি দশ বছর এগার বছর ধরে করতে থাকে তাহলে সে ঐ ফল পেতে বাধ্য, হবেই হবে। কেন? মুরগী যখন ডিমের উপরে তা দিচ্ছে মানে তাপ দিচ্ছে, সেই ডিম থেকে একটা বাচ্চা বেরোবে। ঠিক সেই রকম একটা আইডিয়াকে নিয়ে, একটা ভাবকে নিয়ে কেউ যদি বসে পড়েন, তখন কি হচ্ছে? ঐ আইডিয়াকে তাপ দেওয়া হচ্ছে, ঠিক মুহূর্তে ঐ ভাবটা তার কাছে উন্মোচিত হয়ে যাবে। মুসলমানরা রোজার সময় সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যা তপস্যা করে ওতেই সারা মুসলমান জাতি শক্তি পেয়ে যাচ্ছে। আর শত শত কোটি কোটি মুসলমান এই তপস্যা করে যাচ্ছে বছরের পর বছর। যতই অসুবিধা এসে যাক মুসলমানরা দিনে পাঁচবার নমাজ পড়বেই। যাই হয়ে যাক মুসলমানরা তিরিশ দিন রোজা রাখবে।

জগৎ সৃষ্টিও ঠিক এভাবেই হয়। এই যে ভেতরে সচ্চিদানন্দ আছেন তিনি তপস্যা করেন। কি তপস্যা করেন? একটি মাত্র আইডিয়া বা চিন্তার উপরে তিনি তপস্যা করেন। সেটা হচ্ছে – সৃষ্টি হোক। আমাদের যেমন কোন কিছু সৃষ্টি করতে গেলে অনেক দিন ধরে ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে, ভগবানকে এসব করতে হবে না। আমরা চিন্তা করে আর কতটুকু সৃষ্টি করতে পারব? কিন্তু ভগবানকে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জন্ম দিতে হচ্ছে, সেইজন্য তাঁর তপস্যাও সেই রকম হবে।

যে মুহূর্তে তিনি চিন্তা করলেন সৃষ্টি হোক তখন ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা যখন জন্ম নিলেন তখন তিনিও সৃষ্টির জন্ম তপস্যা করতে থাকেন। যে কোন ভক্ত যখন কোন সমস্যা নিয়ে, চাকরি হচ্ছে না, সন্তান হচ্ছে না, বাড়িতে অশান্তি, শরীর ভালো যাচ্ছে না, যে কোন সমস্যা নিয়ে কোন মহারাজের কাছে গেলেই ওনারা বলেন 'খুব করে ঠাকুরকে ডাক আর জপ কর'। ঠাকুরকে ডাকা আর জপ করা মানেই হচ্ছে তপস্যা করা, তপস্যা করলেই যে তাপ সৃষ্টি হবে তাতেই ফল হতে বাধ্য। নাসদীয়সূক্তমে প্রথমে কোন ঈশ্বরের উল্লেখ নেই, ঈশ্বরের কথা অনেক পড়ে আসছে। সৃষ্টি একটার পর একটা হতে থাকে, একটা আইডিয়া আরেকটি আইডিয়ার জন্ম দিচ্ছে। যে কোন একটা আইডিয়াকে নিয়ে যেই তপস্যা করতে বসে যাবে একটা সময় বুম্ করে বেরিয়ে আসবে। যদি কোন আইডিয়াকে নাও নেয় তাহলেও তপস্যা করলে সে তার অন্য ভাবে নিজের মত একটা ফল দিয়ে দেবে। বেদ বা পুরানে যে সব কাহিনী ও যজ্ঞের কথা আছে সবই এই তপস্যার একেকটা রূপ। বেদের যজ্ঞ, ইদানিং কালে সত্যনারায়ণ পূজা, দুর্গাপূজা, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি যে করা হয় সবই একটা সঙ্কল্প নিয়ে যখন করা হচ্ছে তখন তার ফল হবেই। যেমনটি তপস্যা হবে তেমনটি ফল পাবে। কিন্তু তপস্যা করলে ফল পাবেই, কোন ধর্মই বলবে না যে তপস্যা করলে ফল পাবে না। ঠাকুর বলছেন – কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি কি শুনে ফল দিচ্ছেন? আমি যে প্রার্থনা করছি আসলে আমি তপস্যা করছি।

এখন আমাদের মনে হাজারটা আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে, এই চাই সেই চাই। কিন্তু তপস্যা করছে কি? তপস্যা না হলে ফল হবে না। এখানে এই কথাই বলা হচ্ছে। যখন ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন তখন যে প্রথম যিনি এলেন তিনিও তপস্যা করছেন। এই আইডিয়াটাই পরবর্তি কালে উপনিষদে বার বার আসবে। সেখানে সব কিছুতেই তপস্যা। প্রশ্নোপনিষদে আছে – দুজন ঋষি আরেক ঋষির কাছে গিয়ে বলছেন আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, আপনার কাছে জানতে চাই। সেই ঋষি বলছেন – নিশ্চয়ই উত্তর পাবে, তবে এক বছর এখানে থেকে তপস্যা কর, এক বছর তপস্যার পরে প্রশ্নটি করবে, সেই প্রশ্নের উত্তর যদি আমার জানা থাকে তবেই আমি বলব। তারপরে আছে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র আর অসুরদের রাজা বৃত্র এরা দুজনে প্রজাপতির কাছে প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রজাপতিও তাদের এক বছর তপস্যা করতে বললেন। দুজন মিলে তপস্যা করতে শুরু করলেন। তপস্যা করা মানে, খুব স্বল্পাহারে থেকে, শরীরের সব রকমের সুখভোগ ত্যাগ করে শুধু ঈশ্বর চিন্তন করা। এক বছর তপস্যা করার পর দুজনে প্রশ্ন করলেন অমৃতত্ব কিভাবে লাভ হয়। প্রজাপতি শুধু দুটি কথা বলে দিলেন – তুমিই সেই। দুজনে ফেরত চলে এল। কিছু দিন পরে ইন্দ্রের আবার মনে সংশয় এসেছে। আবার প্রজাপতির কাছে গেলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে আবার এক বছর তপস্যা করতে পাঠিয়ে দিলেন। *তপসস্তন্মাহিনাজায়তৈকম্* - এখানে এইটাই বলছেন তপস্যার জোরে *জায়তম একম্*, এই একের সৃষ্টি হল।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে একটা মন্ত্র আছে – *স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদগং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।* যা কিছু আছে আমি তার সৃজন করব, তিনি এই ভেবে তপস্যা করলেন। বেদে কিছু ভাব আছে বীজাকারে, পরে এই ভাবগুলিকে নিয়েই উপনিষদে আরো বিস্তার করে বলা হয়েছে। তেমনি নাসদীয়সূক্তমে যে তপস্যার কথা পাই ঠিক এই ভাবটাই আবার উপনিষদে এসেছে।

এরপরে প্রশ্ন আসে সৃষ্টি কেন হল। সেই কথা বলতে গিয়ে চতুর্থ মন্ত্রে বলছেন – ***কামস্তদগ্রে সমবর্তুতাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।*** *কামস্তদগ্রে* – এই যে যিনি তপস্যা করছেন তাঁর মনে প্রথমে একটা বাসনা জন্ম নিল। কি বাসনা এল – তৈত্তিরীয় উপনিষদে যেমন বলছে *ইদগং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ*, যা কিছু আছে আমি তার সৃষ্টি করব। বাসনাকে কাম অর্থেও বলা যেতে পারে, তার ফলে অনেক পণ্ডিত এই কামকে পুরুষ-নারীর মধ্যে যে কামের কথা বলা হয়, সেইটাকে এইখানে ধরেছেন। কিন্তু ভাষ্যকাররা এটাকে পুরো প্রত্যাখ্যান করে বলছেন এখানে সৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে। এখন সমস্যা হয় – *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যিনি ভগবান তিনি হচ্ছেন আপ্তকাম সুতরাং তাঁর মধ্যে স্পৃহা আসবে কেন? যার অভাব আছে তারই স্পৃহা হবে। ভগবানের তো কোন অভাব নেই তাহলে তিনি সৃষ্টি কেন করলেন? এর কি উত্তর আছে? আসলে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। যে কোন দ্বৈত দর্শনের বিরুদ্ধে, সে ইসলামই হোক বা খ্রীশ্চান ধর্মই হোক এটাই হচ্ছে প্রধান অভিযোগ। এর কোন উত্তর তাদের কাছে নেই। মাণ্ডুক্যকারিকাতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যিনি আপ্তকাম, যিনি পূর্ণকাম তাঁর আবার কিসের স্পৃহা হবে, তিনি কেন সৃজন করতে যাবেন? সমস্ত দ্বৈত ধর্মের সামনে এটা একটা বিরাট সমস্যা। তখন তারা বলবেন যে আমরা যাতে ভালো হই সেইজন্য ভগবান সৃষ্টি করলেন এই কথা বলা হয়েছে। এখানে তুমিটা কোথায়, তুমি কে? তাঁকে যখনই আপ্তকামী বলে দেওয়া হচ্ছে তখন তো আর কিছুই দাঁড়াবে না। ঠাকুর তাই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন – আম খেতে এসেছ আম খাও, ডাল পাতার হিসাব করতে যেওনা। এই প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। একটা লাইনের পর আর প্রশ্ন করা যায় না। আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আমাকে যেতে হবে – এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখান থেকে পালাতে কিভাবে হবে তার উত্তর পেয়ে যাবে।

গৌতম বুদ্ধকেও এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনিও কোন উত্তর না দিয়ে বললেন – তোমাকে যদি কেউ বিষযুক্ত তীর মারে তখন তুমি কি জানতে চাইবে কে তীরটা ছুড়েছে? তুমি কি জানতে চাইবে তীরটা কে বানিয়েছিল? তুমি কি জানতে চাইবে যে তীর মেরেছে সে কি সত্যিকারের কোন তীরন্দাজ? তুমি কি তার বংশের পরিচয়, তার জাতের পরিচয় জানতে চাইবে? এই সব খবর না জেনে তুমি আগে তীরটাকে তোমার শরীর থেকে বের করে নেবে, ক্ষত স্থানে শুশ্রুষার জন্য কোন বৈদ্যের কাছে ছুটে যাবে। এগুলোর উত্তর থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে কিন্তু আগে তোমার প্রাণটি বাঁচাও। ঠাকুর যে বলছেন – আম খেতে এসেছ আম খাও। এই কথা কি ঠাকুর একা বলেছেন, বুদ্ধদেবও এই একই কথা বলছেন, যিশুও এই একই সুরে এক কথা বলছেন – এই তো তোমার সামান্য জীবন আগে কোন রকমে প্রাণ বাঁচাও। কিন্তু কোন কোন সময় ফাঁক পেলে মাথায় কিছু কিছু প্রশ্ন উঁকি মারে, তাই বলে দিলেন – *কামস্তদগ্রে*, প্রথমে তাঁর মনে ইচ্ছে জাগল। একেবারেই যদি কিছু উত্তর তাঁরা না দেন তাহলে লোকেদের মনে প্রচুর জিজ্ঞাসা থেকে যায়, সেইজন্য ওনারা দু-চারটে টুকটাক কথা বলে দেন। কিন্তু এটাকে বেশি যদি কাটাছেঁড়া করতে যাই তাহলে মুখ থুবড়ে পড়ে যাব।

গুজরাট ভূমিকম্পে প্রচুর লোক মারা গিয়েছিল। একজন সিনিয়র মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে প্রশ্ন করেছিলেন – মহারাজ এই যে সবাই বলে কর্মের জন্যই এই রকম হয়, কিন্তু এত এত লোকের কর্মে কি এইটাই ছিল যে এরা সবাই এক সঙ্গে এই ভাবে মারা যাবে? স্বামী ভূতেশানন্দজী একটু গম্ভীর হয়ে বলছেন – লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে এটা মানছো তো? বলছেন – হ্যাঁ মানছি। তাহলে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, একটা কর্ম করলে তার একটা ফল আছে, এটা মানছো তো? হ্যাঁ মানছি মহারাজ। তখন ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলছেন – যেটা তোমার ব্যষ্টিতে লাগাচ্ছ, মানে ছোটতে লাগাচ্ছ, ঐটাকে তুমি বৃহৎটাতেও লাগিয়ে দাও। কেননা, ঠিক ঠিক এর কারণ যদি তুমি খুঁজতে যাও তাহলে কোন দিন এর কারণ খুঁজে পাবে না। গুজরাট ভূমিকম্পে এত লোক কেন এক সঙ্গে মারা গেল এর উত্তর সারা জীবন যদি খুঁজতে যাও কোন দিন এর উত্তর তুমি পাবে না। তখন কি হবে? তোমার মনটা ওর মধ্যেই ঘুরতে থেকে যাবে, এই জগতে তোমার আর কিছু করা হবে না। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিতে হবে তো, এত লোক মারা

গেলে কেন? লঙ্কা খেলে যেমন ঝাল লাগে, কর্মের ফলের সঙ্গে যেমন কর্মের সম্পর্ক থাকে, ঠিক তেমনি এত লোক যে মারা গেল এদের প্রত্যেকরই কোন কর্ম ছিল। তাহলে এটাই কি একমাত্র সঠিক বিশ্লেষণ? হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কর্মফল কাদের জন্য? যারা আধ্যাত্মিক পিপাসু তাদের জন্যই কর্মফল। যারা আধ্যাত্মিক পিপাসু তাদের মনে কখন একটা প্রশ্ন খোঁচা দিল, নিজের মনকে শান্ত করার জন্য একটা উত্তর দিয়ে নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে চল।

বেদ ঠিক এই জিনিষটাই করছে। মানুষের মধ্যে সৃষ্টি সংক্রান্ত, জগতের নানা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, বেদ তখন একটা উত্তর দিয়ে বলে দিচ্ছে – তুমি এর বেশি আর কিছু জানতে চেষ্টা করো না, তোমার জীবন অতি ক্ষুদ্র, খুব অল্প সময় তোমার হাতে আছে, এই সময়টুকুকে কাজে লাগিয়ে তোমার চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চল। উপনিষদেও প্রশ্ন করা হয়েছে – *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, ভগবান পূর্ণকাম হয়েও কেন তিনি সৃষ্টি করতে গেলেন। এই প্রশ্নের উপসংহার কি? এর উপসংহার হচ্ছে সৃষ্টি বলে আদপেই কিছু নেই। তাহলে এগুলো কি দেখছি? এসব যা কিছু দেখছ এগুলো তোমার মনের ভ্রম। এই তত্ত্বটা কাদের জন্য? যারা খুব উচ্চ আধারের পুরুষ, তাদের জন্য জগৎ বলে কিছু নেই।

কিন্তু আমাদের জন্য বলা হচ্ছে – প্রথমে এসেছিল বাসনা, কামস্তদগ্রে। পরে ফ্রয়েডাদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এরই উপরে অনেক থিয়োরি নিয়ে এলেন। প্রত্যেক মানুষের মনে প্রথম যে বাসনা আসে তা হচ্ছে আমি কিছু সৃজন করব। সৃষ্টিতে প্রথম যাঁর আবির্ভাব হল, তাঁরও মনে সৃষ্টির বাসনা জেগেছিল।

চতুর্থ মন্ত্রের পরের লাইনে বলছেন *সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা* , যাঁরা কবি, এখানে কবি মানে ঋষি, ত্রিকালদর্শি, শুধু ত্রিকালদর্শি নন, যে জিনিষ সাধারণ দৃষ্টিতে অবোধগম্য সেটাও তাঁদের কাছে বোধগম্য। আর যাঁরা মনীষি, অর্থাৎ যাঁদের বুদ্ধি আছে প্রজ্ঞা আছে, যাঁরা যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এই কবি, মনীষিরা অন্ধকারের আবরণকে ভেদ করে দিতে পারেন। বেদে অবতারের কথা নেই, উপনিষদেও অবতার পাওয়া যাবে না, বেদ ও উপনিষদে যাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদেরকে ঋষি বা কবি বলা হয়। মানুষের মধ্যে কবি হচ্ছে সব থেকে উচ্চ পদ, কবির উপরে আর কেউ নেই। সেই অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদের ভাষায় একজন কবি। বেদের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, যিশু এরা কেউ ভগবান বা দেবতা হতেন না, সবাইর উপাধি হত কবি। শ্রীরামকৃষ্ণের মত কবি ও মনীষিরা *সতো বন্ধুমস্তি নিরবিন্দন্ হৃদি*, মানে তিনি যখন ধ্যান করতে শুরু করলেন, ধ্যান করে যখন ধ্যানের গভীরে চলে গেলেন, গভীর থেকে আরো গভীরে চলে গেলেন তখন তিনি সৎ আর অসৎএর, শূন্য আর পূর্ণের মধ্যে কি সম্পর্ক, সেটাকে উপলব্ধি করলেন। কবিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে হৃদয়ে এই সত্যটাকে দেখতে পেলেন।

এখানে জ্ঞানের উন্মোচন কিভাবে হয় তার বিবরণ দেওয়া হল। বাইরে থেকে কিছু জ্ঞান লাভ হয় না, যা কিছু জ্ঞান উপলব্ধি হবে সব এই হৃদয়ে হবে। ঠাকুর যখন নির্বিকল্প সাধনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তখন তিনি জ্ঞান অসি দিয়ে মাকালীকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন, তারপর তাঁর মনটা এই মায়ার রাজ্য ছেড়ে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে যে উপলব্ধি হচ্ছে, এই বুদ্ধি ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজির থিয়োরি জানার বুদ্ধি নয়। এইটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞালোকে তাঁরা বুঝতে পারেন অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের মধ্যেকার যোগসূত্র, সৎ আর অসৎএর সম্পর্ক।

স্বামীজী মায়াকে ব্যাখ্যা করছেন দেশ, কাল ও কারণ দিয়ে। ব্রহ্ম যিনি এই দেশ, কাল ও কার্য-কারণের পারে, তিনিই এই মায়ার ভেতর দিয়ে জগৎ আকারে বহু রূপে প্রতিভাসিত হচ্ছেন। এই এক কি করে বহু হয়ে যায়? দেশ, কাল আর কারণ হচ্ছে পর্দা। আমি, আপনি, গাছ-পালা, ঘরবাড়ি সব আছে, কিন্তু তথাপি বলছে এই সব কিছু যা আছে তার জন্ম হবার আগে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না। তাহলে কে জানল যে *নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ*? ঋষিরাই জানলেন। কিভাবে জানলেন? ধ্যানের গভীরে? কোথায় দেখলেন? তাঁদের হৃদয়ে। সেইজন্য বারবার বলা হয়, আচার্যের কাছে যতই শোনা হোক, সারা জীবন ধরে

শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে যেতে পারে, কিন্তু কিছুই হবে না। এই সব কিছু যা বলা হচ্ছে এগুলি হচ্ছে সাধনা সাপেক্ষ। ধ্যানের গভীরে যতক্ষণ না যাবে ততক্ষণ ধারণা হবে না। জপের গভীরেও নয়, এখানে জপও অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর সাধনা। ধ্যানের গভীরে মানে, যখন দিনে সাত ঘন্টা, আট ঘন্টা এক আসনে একটা ভাবকে নিয়ে বসে আছে। এক দিন দুই দিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর করলে একটু একটু করে বোঝা যাবে যে মায়ার আবরণ সরছে। তখন বোঝা যাবে এই সৎ ও অসতের, ব্রহ্ম ও জগত, নিত্য ও অনিত্য, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে কি সম্পর্ক। তখন বোঝা যাবে সৎও নেই অসৎও নেই তথাপি কি করে হঠাৎ সৃষ্টি এসে যাচ্ছে। আবার সেই সৃষ্টির সময় যখন কিছুই ছিল না তার বর্ণনাও দিচ্ছেন। পরীক্ষাগারে গবেষণা করে এটাকে জানা যায় না, ধ্যানের গভীরে গিয়ে ঋষিরা, কবিরা অনুভূব করেন – ও, এই ব্যাপার।

ঠাকুর বলছেন – নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রে গলে মিশে গেল, তার আর খপর দেওয়া হল না। নুনের পুতুলের সত্তা সমুদ্রের সত্তার সাথে এক হয়ে গেল, তাহলে খবরটা আসছে কোথা থেকে যে নুনের পুতুল সমুদ্রে মিশে গেছে? ঠাকুর বলছেন – আমারও তাই হচ্ছিল, কিন্তু কে যেন আমাকে বাঁচিয়ে দিল, আমাকে পাথর করে দিল, আমার আর গলা হলো না। এর তাৎপর্য হচ্ছে – অনন্ত + এক = অনন্ত। অনন্ত হোটেলে ঢুকে পড়লে আর কেউ বেরোতে পারেনা। কিন্তু কোন কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তি পারেন। কারণ তাঁরা তাঁদের ব্যক্তি সত্তাকে সেই অনন্তের মধ্যেও ধরে রাখেন। নুনের পুতুল সমুদ্রে যাচ্ছিল, যেতে যেতে হঠাৎ এক দৈবশক্তিতে ম্যাজিকের মত নুনের পুতুল হয়ে গেল পাথরের। সে এখন সমুদ্রে ডুবে সব খবর নিয়ে আবার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে চলে এল। যদি সে বেরিয়েই চলে এল, তাহলে তো আরেকটা সমস্যা এসে গেল। সমস্যাটা হচ্ছে, সেতো সমুদ্রে একাকার হয়ে যেত পারলো না, তাহলে কি খবর দেবে। কিন্তু আস্বাদন হয় বলে তার একটা অনুভূতি থেকে যায়। মন হচ্ছে সান্ত আর ঈশ্বর হচ্ছেন অনন্ত, সান্ত মন যখন অনন্তের সাথে মিশে যায়, মনের ওখানেই নাশ হয়ে যায়। একটা ছোট পাত্রে গঙ্গার জল আছে, এখন সেই পাত্রটার গঙ্গা জলকে গঙ্গায় ঢেলে দেওয়ার পর পাত্রের জলকে আর আলাদা করে দেখা যাবে না, কেননা সেই জল অনন্ত জলের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ মনে করেন যে আমি ঐ পাত্রে যে জলটুকু ছিল সেই জলটুকুকেই ফেরত নিয়ে যাব। ধরা যাক পাত্রের গঙ্গাজলের চৈতন্য আছে। এখন এই ক্ষুদ্র চৈতন্য সেই বৃহৎ চৈতন্যে মিশে যাবে তখন তার কি হবে আমরা চিন্তাই করতে পারব না। গঙ্গা বলবে আমি যা তুইও তাই। এবার পাত্রটাতে গঙ্গাজল ভরে আবার বাড়িতে ফেরত চলে এল। এখন বাড়িতে যে অন্যান্য আরো পাত্র রয়েছে সে তাদের বলছে গঙ্গা যা আমিও তাই, কিন্তু এখন যে আমি বলছে এই আমিটা হচ্ছে সেই গঙ্গার সঙ্গে নিজেকে অভেদ জ্ঞানে বলছে গঙ্গা যা আমিও তাই। কারণ পাত্র হিসেবে আলাদা কিন্তু গঙ্গা জল হিসেবে গঙ্গা যা আমিও তাই। পাত্র হিসেবে আলাদা আলাদা। তখন অন্য পাত্র বলছে গঙ্গা কতটা বড়? আরে ভাই কতটা বড় তা কি কখন বলা যাবে! কেন বলা যাবে না? স্বামীজী সেই কুয়োর ব্যাঙ আর সমুদ্রের ব্যাঙের গল্পে যেমন কুয়োর ব্যাঙ বলছে – তোমার সমুদ্র কি এই কুয়োটার থেকেও বড়? না। কুয়োর এক দিক থেকে আরেক দিকে লাফ দিয়ে দেখিয়ে বলছে 'তোমার সমুদ্র কি এতটা বড়'? আর সমুদ্রের ব্যাঙ ততই বলে যাচ্ছে – না। কুয়োর ব্যঙ বলছে – তুমি ধাপ্পা মারার জায়গা পেলে না। তাই হয়, এই পাত্র যখন গঙ্গা থেকে ফেরত আসবে তখন বাড়ির বাকী পাত্র গুলি তাকে বলবে যত সব অযৌক্তিক আর গালগপ্পো।

ঠাকুরও বলছেন – কাকেই বা বলি আর কেই বা বুঝবে। কিন্তু ঋষিরা তাঁদের এই জিনিষ গুলিকে সমস্ত মানবজাতি শোনাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে বলেন – *শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রা আয়েধামানি দিব্যানি। নান্যপন্থা হয়নায়।* সবাই শোন আমরা সবাই হচ্ছি সেই অমৃতের সন্তান, এইটাকে না জানা ছাড়া কোন পথ নেই।

ঠাকুরকে নরেন জিজ্ঞেস করছে – আপনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? ঠাকুর – হ্যাঁ করেছি। নরেন – আমাকে দেখাতে পারেন? ঠাকুর – হ্যাঁ করাতে পারি। ঠাকুর কিন্তু কখনই ঈশ্বর কি রকম বর্ণনা দিচ্ছেন না। কিন্তু বলছেন আমি দেখেছি তুইও দেখতে পারবি। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে বাড়ি এসেছে, তার বন্ধু জিজ্ঞেস করছে – হ্যাঁরে স্বামী সুখ কি রকম? মেয়েটি বলছে – তোর যখন বিয়ে হবে তখন তুই বুঝতে পারবি। ঠাকুরও নরেনকে কোথাও বলছেন না যে ঈশ্বর এই রকম সেই রকম, বলছেন তুইও দেখতে চাইলে দেখতে পারবি। বেদ উপনিষদেও বলছে আত্মানুভূতি লাভ করতে হলে তোমাকে সব অতিক্রম করতে হবে, এখানে বেঁধে রাখলে হবে না। বাইবেল আর কোরানে সাথে আমাদের এইখানেই পার্থক্য। ওদের কাছে এই জগতটাই হচ্ছে চরম সত্য, কিন্তু আমাদের কাছে এটাও মিথ্যা, একেও অতিক্রম করতে হবে। কারণ এগুলো অনন্তের বর্ণনা করতে চাইছে কিন্তু অনন্তের কখনই বর্ণনা হয় না। সৎ ও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না, কিছু ছিল না তাও বলা যায় না, ছিল তাও বলা যায় না, beyond nothingness and also beyond is ness, এই এক উদ্ভট্ এক জিনিষের সাথে জগতের কি সম্পর্ক আমরা কি করে জানব। কারণ আমরা তো এর অনেক নীচে পড়ে রয়েছি। বাবার জন্মের খবর ছেলে কি করে জানবে। বাবার জন্মের কেউ যদি ভিডিও করে রাখে তাহলে অবশ্য দেখতে পারবে। ঋষিরা যে ধ্যান করে জানছেন এইটাই ঠিক এই ভিডিও দেখার মত।

চতুর্থ মন্ত্রের শব্দগুলি যে যেরকম অর্থ করবে এর অনুবাদও সেইভাবে পাল্টে যাবে। *কামস্তদগ্রে সমবর্তুতাধি* – সৃষ্টির প্রথমে বলছেন সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না। ঠিক আছে এটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তারপরে কি হল? সেটাকেই বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে – যিনি ছিলেন তাঁর মনে হঠাৎ কাম জাগল। এই কাম শব্দকে অনেকে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা কামকে একমাত্র নারী-পুরুষের যৌন ইচ্ছাকেই মনে করে। কিন্তু যারা হিন্দু ধর্মের পরম্পরা ঐতিহ্যকে বিশ্বাস করেন তারা কামের এই ধরণের ব্যাখ্যা কখনই মানবে না। নাসদীয়সূক্তমের এই কামের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা। এর পরই প্রশ্ন আসবে কিসের ইচ্ছা? সৃষ্টির ইচ্ছা। কিন্তু এইটাই একটা রহস্য, যে ভগবানের একটা নাম হচ্ছে আপ্তকাম বা পূর্ণকাম তাঁর মনে কোন ইচ্ছার উদয় হবে কেন? উপনিষদের একটা জায়গায় বলা হচ্ছে – *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, মানে যিনি আপ্তকাম তাঁর আবার স্পৃহা কিসের। এই কারণেই বলা হয়, সৃষ্টি বিষয়ক কোন প্রশ্নেরই উত্তর কোন ভাবেই দেওয়া যায় না, যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, সব ব্যখ্যাতেই একটা ফাঁক থেকে যাবে। প্রথমে বলা হয়েছিল এক ছিলেন, সে এক দুইএর পারই বলি আর যাই বলি যা ছিল সেটাকেই বলা হচ্ছে এক ছিল। কিন্তু সেই এক অখণ্ড থেকে বহু হল কি ভাবে? এক থেকে দুই আর মধ্যে যে যোগসূত্র বা বলা হচ্ছে আনীদবাতং, মানে শক্তির খেলা শুরু হল, সবই তো বোঝা গেলে, কিন্তু কেন শুরু হল?

বিজ্ঞানও এই কেনর কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছে না। কিছু দিন আগে ফিজিক্সের একটা থিয়োরি বেরিয়েছে তাতে বলছে আমরা এই দৃশ্য জগতের যা কিছু দেখছি, গ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ সব কিছুর ওজন হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র ওজনের মাত্র একশ ভাগের পাঁচ ভাগ। তাহলে বাকী ৯৫ ভাগ কি জিনিষ? বিজ্ঞান বলছে এটা জানার কোন উপায়ই নেই, অথচ সেটা আছে। এর মধ্যে যত বস্তু আছে তারা কোন আলোকে শোষণও করে না আবার কোন আলো বিকিরণও করে না। আমরা যখন কথা বলছি সেই সময় এই particles ক্রমাগত আমাদের শরীররে মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের একজনের যা ওজন তার ঊনিশ গুণ বেশি ওজনের ঐ বস্তুগুলো এখানে রয়েছে। এইটাই সবার কাছে এক রহস্য, আমাদের ঋষিদের কাছেও এগুলো রহস্যময় ছিল। একটা পয়েন্টের পরে এই সৃষ্টির রহস্যের উত্তর দেওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ মনে প্রশ্ন উঠবে কেন সৃষ্টি হল? তখন বলবে – ইচ্ছা জাগল, কামস্তদ্গ্র, প্রথমে কাম এল। উপনিষদেও পাই – আমি এক, আমি বহু হব। এই উপনিষদেই এক জায়গায় বলা হচ্ছে – *কামময় এবায়ং পুরুষঃ* – প্রথম যিনি পুরুষ তিনি কামময়। সচ্চিদানন্দ সচ্চিদানন্দই, কিন্তু যখন তাঁর মধ্যে ইচ্ছা এসে যায় তখন সচ্চিদানন্দের মধ্যেই যেন একটা বিভেদ এসে গেল। ইচ্ছে যার হবে তার মধ্যে তো চৈতন্য থাকতেই হবে। এই যে বোতলটা আছে এর মধ্যে কোন ইচ্ছে বোধ নেই, কেন নেই? এর কোন

চৈতন্য নেই। যদি বোতলটা ভেঙ্গে গিয়ে একশ টুকরো হয়ে যায় তখন এর পেছনে দুটো সম্ভবনা থাকতে পারে। এক, হয় বাইরে থেকে কোন শক্তি এসে একে ধাক্কা মেরে ফেলে ভেঙ্গে দিয়েছে আর দুই, বোতলের ভেতরেই কিছু বিষ্ফোড়ণ হয়েছে। এই দুটোর বাইরে তৃতীয় কোন সম্ভবনা নেই।

কিন্তু আমি যদি কিছু করি, আমি এই বোতলের মত নই, আমার মধ্যে চৈতন্য রয়েছে, এখন কিছু করার আগে আমার মধ্যে ইচ্ছাকে জাগাতে হবে – এইটি আমি করব। সৎ আর অসৎ এই দুটোর পারে যখন বলছে তখন কিন্তু চৈতন্যকে বাদ দিচ্ছে না এই ইচ্ছাকে জাগ্রত করাটাই পার্থক্য করে দিচ্ছে। চৈতন্য যখন নিজেকে বহু করছেন তখন বলতে হবে এই বহু হওয়ার আগে তাঁর মনে ইচ্ছা এল। যারা পাগল তাদেরও মনে আগে ইচ্ছা জাগে তারপরই কোন কিছু করে। এইটাকেই এখানে বলছেন *কামস্তদগ্রে সমবর্তুতাধি* – তার মনে আগে কাম জাগল। মনে হতে পারে এটা এমন কি আর নতুন কথা। আমাদের মনের যত রকমের আবেগ রয়েছে, এই কাম বা ইচ্ছাটাই হচ্ছে প্রথম আবেগ। সেইজন্য বলা হয় জগতে যত রকমের সৃষ্ট পদার্থ রয়েছে তাদের সৃষ্টির প্রথমে রয়েছে কাম। কেন থাকে? কারণ, *কামময় এবায়ং পুরুষঃ*, যিনি প্রথম পুরুষ ছিলেন তিনি হলেন কামময়। তাঁর পুরো শরীরটাই কাম দ্বারা গঠিত। এই কাম বা ইচ্ছা কোন খারাপ বা নোংরা কিছু নয়।

এরপরে বলছেন - *মনসো রেতঃ* – এখানে *রেতঃ* এই শব্দের আবার অনেক রকম অর্থ হয়। হিন্দীতে রেত কথার অর্থ হয় বালি। রেত বলতে আবার নারীর শরীর থেকে এক ধরণের fluid নির্গত হয়, সেই fluid কেও রেত বলছে। আবার রেত বলতে যে কোন জিনিষের বীজকেও বোঝায়। এখানে বীজ অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে – এইটাই হচ্ছে মনের প্রথম বীজ। মনের মধ্যে যাবতীয় যা কিছু হয়, শুধু যে আমার আপনার মনের মধ্যে হচ্ছে তা নয়, ভগবানের মনের মধ্যেও যা কিছু হচ্ছে তার মধ্যে প্রথম যে বীজ সেটা হচ্ছে কাম। ফ্রয়েড আবার এই কামকে নিয়ে গেলেন libido mertico তে, মানে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে desire to mate, পুরুষ-নারীর মিলন, আর সেইখান থেকে চলে গেলেন desire to destroy, শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছা। এখানে কিন্তু একেবারেই তা নয়। প্রথম আসে অবিদ্যা, অবিদ্যার পরই আসে কাম, কামের পরেই আসে কর্ম। একটা কাম যখন এসে যাবে তখন একটার পর একটা আসতে থাকবে – কাম ক্রোধকে জন্ম দেবে, লোভকে জন্ম দেবে, একে একে মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সব এসে যাবে। এগুলি থেকে নানা রকমে বন্ধন সৃষ্টি হবে, সেই বন্ধনকে জড়িয়ে তার আবার নানা রকমের জটিলতার জন্ম হবে। কিন্তু যিনি ভগবান, যিনি আদি পুরুষ, তাঁর এই সব সমস্যা হয় না, কারণ তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দিয়ে তৈরী। তাঁর মধ্যে শুধু সৃষ্টি করার কামটুকুই আছে, সৃষ্টি হয়ে গেলে সেই কাম সেখানেই শেষ হয় যায়। কিন্তু যারা সাধারণ তাদের মধ্যে যখন কামের জন্ম হয় তখন আর সেটা থামে না, কামের প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

মনের প্রথম বীজ হচ্ছে কাম, এই কাম আমরা কাম বলতে যা বুঝি একেবারেই কিন্তু তা নয়, এই কাম হচ্ছে ইচ্ছা। উপনিষদে এনারা যেটাকে একেবারে পবিত্র ইচ্ছা বলছেন, যেটা ভগবানের মনে এসেছিল – *একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়িনী* – আমি এক, আমি বহু হব। এই ভাবটাই যখন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন বলে আমি আমার এই সন্তানের মাধ্যমে অনেক হব। নিজের সন্তানের মাধ্যমে আমি বহু হব, এই ইচ্ছা এ্যামিবা থেকে শুরু করে ভগবান পর্যন্ত এইটাই এক সাধারণ ইচ্ছা। ঠাকুর যে বলছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, কিন্তু উপনিষদে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ এই শব্দ নেই। সেখানে আছে পুত্রৈষণা ত্যাগ, এই ত্যাগের অর্থ হচ্ছে – একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়িনী – আমি এক, আমি বহু হব এই ইচ্ছাটাকে ত্যাগ করে দেওয়া। সন্তান লাভের ইচ্ছাকে ত্যাগ করে দেওয়া। কিন্তু সন্তানের ইচ্ছাকে ত্যাগ করে দিলে কি হবে, ইচ্ছা ব্যাপারটা কি ত্যাগ হয়ে যাবে? হয় না, তখন এই ইচ্ছাটাই আবার নানান রূপ ধারণ করে নেয় – আমি একটা বই লিখেছি এবার আমি দশটি বই লিখব, আমি একটি বাড়ি করেছি এর পর আমি আরও দশটি বাড়ি করব, একটি গাড়ি করেছি আরও চারটে গাড়ি করব। কোন না কোন ভাবে এই ইচ্ছাটা বর্দ্ধিত

হতে থাকবে। সেইজন্য বলা হয় – পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ করতে। যা কিছু মনের মধ্যে হচ্ছে তার মূলে এই কাম।

তারপরের লাইনে বলছেন *সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা* - এই লাইনে আবার একটা গভীর তত্ত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। চিন্তা করলেই অবাক হয়ে যেতে হয়, আজ থেকে প্রায় সাত-আট হাজার বছর আগে ঋষিরা এই রকম একটা উচ্চ তত্ত্বের চিন্তা করে তাকে বাক্যে প্রস্ফুটিত করেছিলেন। নাসদীয় সূক্তের প্রথম লাইন ছিল – *নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ* - তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, সৎ হচ্ছে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সৎ হচ্ছে কার্য আর অসৎ হচ্ছে তার কারণ। এখানে এখন বলা হচ্ছে যিনি স্রষ্টা মানে ভগবান যিনি, তিনি কার্যও নন আবার কারণও নন, এই দুটো থেকে তিনি বিলক্ষণ আলাদা। কিন্তু মাঝখান থেকে দুটো উদ্ভট শব্দ এসেছে – অসৎ আর সৎ। হিন্দু ধর্মের এইটাই একটা বিরাট সমস্যা – অসৎ থেকে সৎ এর কি করে উৎপত্তি হল, আবার সৎ থেকে অসৎএর উৎপত্তি কি ভাবে হল। সৎ বলতে অনেক সময় ভগবানকে বোঝায়, কিন্তু সাধারণতঃ বলা হয় ভগবান সৎ অসতের পার। কিন্তু যিনি সৎ, সচ্চিদানন্দ, তিনি মায়াকে জন্ম দিলেন কি করে? যিনি চিৎ তিনি অজ্ঞানকে কি করে জন্ম দিলেন? আমরা দীর্ঘকাল ধরে এই সৎ ও অসৎ এর আলোচনা করে যাচ্ছি, কিন্তু এখনও আমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না। বেদান্তে একটা কথা আছে রজ্জুতে সর্প ভ্রম। হৃষিকেষের ঐ দিকে এক আশ্রমে এক সন্ত মহাত্মা সব সময় তাঁর শিষ্যদের বোঝাতেন রজ্জু মে সাপ হ্যায়। আশ্রমের বাইরে দুই কাঙালী বসে থাকত কিছু খাবারের আশায়। অনেক দিন একই কথা শোনার পর এক কাঙালী আরেক কাঙালীকে বলছে – ইয়ে এক আজব কা সাপ হ্যায়, সাধুবাবা রোজ তাড়িয়ে দেয় আবার কোথা থেকে চলে আসে। সমস্ত বেদান্ত জুড়ে খালি এই রজ্জু আর সাপ, আমাদেরও এখন নাসাদীয়সূক্তম্ বুঝতে গিয়ে সৎ ও অসৎ নিয়ে পড়েছি।

এখানে যেটা বলতে চাইছে তা হচ্ছে, প্রথম সত্তা হচ্ছে ভগবানের, তিনি সৎ অসৎ এর পার, তিনি সচ্চিদানন্দ। সেখান থেকে এসে গেল অবিদ্যা আর তার কার্য। যিনি সচ্চিদানন্দ, চিৎস্বরূপ, তাঁর অবিদ্যাটা আসে কি করে, এইটাই রহস্য, যেন বলছে দুধ থেকে কালোর জন্ম হচ্ছে। কিন্তু দুধ থেকে কালোর জন্ম কখনই হতে পারে না। ঠিক সেই রকম যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁর থেকে কি করে অসৎ এর জন্ম হচ্ছে, অথচ তাঁকে অসৎ বলেও আখ্যা দেওয়া হয় না। আবার সেই অসৎ থেকে সৎ এর জন্ম হচ্ছে। এই চারটে জিনিষের পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুতেই মেলানো যায় না। এই চারটে হচ্ছে ঈশ্বর, জীব, জগৎ ও মায়া। ঈশ্বর বলতে আমরা এখানে সেই সচ্চিদানন্দকেই বোঝাচ্ছি। এই সচ্চিদানন্দে যখন মায়া এসে যাচ্ছে তখন আরও দুটো সত্তা এসে যুক্ত হচ্ছে – একটা জীব আরেকটি জগৎ। এখন ঈশ্বরের সাথে মায়াকে কিছুতেই মেলানো যাবে না। অন্য দিকে মায়ার সঙ্গে জীব আর জগৎকেও কিছুতেই মেলানো যায় না। তাই ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগৎকে কখনই মেলানো যাবে না। অথচ সমস্ত শাস্ত্রই, ইতিহাস, তন্ত্র, উপনিষদ, পুরান যাই বলুন, সবাই এই চারটের সম্পর্ককে নিয়েই নানান ভাবে আলোচনা করে যাচ্ছে। শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রেই নয়, কোরান, বাইবেল, গুরুগ্রন্থ যেখানেই চোখ রাখব সেখানেই দেখতে থাকব তারা এই চারটে জিনিষকে নিয়েই আলোচনা করছে। কিন্তু ঈশ্বর, সে যারই ঈশ্বর হোক, খ্রীশ্চানের হোক, মুসলমানের হোক, যারই ঈশ্বর হোক, তিনি আছেন আর তিনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ। যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি আনন্দস্বরূপ, তাঁর মধ্যে নিরানন্দটা কোথা থেকে এলো, যিনি জ্ঞানস্বরূপ মাঝখান থেকে তাঁর মধ্যে এই অজ্ঞানটা কোথা থেকে চলে এল। সবই যদি সেই সচ্চিদানন্দ যদি হয় তাহলে মানুষের মধ্যে হতাশা আসছে কেন, কেন তারা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে? যিনি সৎ স্বরূপ মানে তিনি সব সময়ই আছেন তাহলে মৃত্যু কেন দেখছি, কত কিছুর নাশ কেন হয়ে যাচ্ছে? এগুলো কিছুতেই মেলানো যাবে না। অথচ বলছে *সতো বন্ধুমসতি* – সৎ আর অসৎ হচ্ছে এক অপরের বন্ধু, এক অপরকে ছাড়া চলতে পারেনা। সৎ থাকলেই অসৎ থাকবে, অসৎ থাকলেই সৎ থাকবে।

সৎ আর এই অসৎএর মধ্যেকার এই সম্পর্ককে যদি উপমা দিয়ে আলোচনা করা যায় তাহলে ব্যাপারটা আরো ভালো পরিষ্কার হতে পারে। মনে করা যাক আমরা একটা ঘরে বসে আছি, ঘরটা পুরো অন্ধকারে ঢাকা। বাইরে থেকে কেউ যাচ্ছে, সে উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছে 'এই ঘরের ভেতরে কেউ আছে'? এখন সবাই যদি চুপ করে থাকে তাহলে সে ভাববে ঘরে কেউই নেই। তার কাছে ঘরটা পুরো অন্ধকারে ঢাকা, পুরো জিনিষটা অসৎ হয়ে গেছে। ঘরটা অসৎ হয়ে গেছে মানে, ঘরে কেউ আছে কি নেই এটা জানার কোন উপায় নেই। এখন হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল, তারপর ঘর থেকে এক এক করে লোক বের হতে শুরু করল। তখন যে মনে করেছিল ঘরে কিছুই নেই সেই অবাক হয়ে ভাববে – বাবা, ঘরে এত কিছু ছিল! সব কিছুই আছে কিন্তু অসৎ, মানে কিছু যে আছে সেটাকে বোঝবার মত কোন চিহ্ন নেই, সৎ হচ্ছে এর ঠিক উল্টো যখন আমরা কোন লক্ষণ দেখে বুঝতে পারে যে এখানে অনেক কিছু আছে। যখন উপায় পাওয়া গেল, আলো এসে গেলে বুঝতে পারলাম যে ঘরে অনেক কিছু আছে। এখানে সৎ অসতের মধ্যে এক হয়েছিল। সৎ এর জন্ম সব সময় অসৎ থেকেই হয়। ভোরের অন্ধকারে যেমন যেমন সূর্য উদয় হতে থাকবে তেমন তেমন আস্তে আস্তে পাখিরা ডাকতে থাকে, তারপর আলো যত একটু একটু করে ফুটতে থাকবে একটা একটা করে গাছ-পালা গুলি চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে, মানুষ, গরু পশু চলাচল করতে শুরু করছে, তারপর সমস্ত কিছুই পরিষ্কার হয়ে সামনে চলে আসে। মনে হবে যে সমস্ত জগৎটা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। সৃষ্টি যখন হয় তখন ঠিক এই রকমই হয়। অন্ধকার কোথাও কিছু নেই, মনে হয় যেন এখানে কিছুই নেই, তারপর আলো যেই ফুটে গেল তখন একটার একটা পর পর যেন বেরিয়ে আসতে থাকে। এই ভাবেই বলা যায় যে সৎ অসতের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তথাপি এটার কোন অর্থই হয় না। অসৎ বা অবিদ্যা সচ্চিদানন্দ থেকে জন্ম নিচ্ছে এই ব্যাপারটাও আমাদের যেন চিন্তার বাইরে। অথচ বেদ নাসদীয়সূক্তমের মধ্য দিয়, যে নাসাদীয়সূক্তম্‌কে সমস্ত বিদ্বদজন গভীর দার্শনিক তত্ত্বের উদ্‌গাতা বলে মনে করেন, এই কথাই বলছে।

যখন ম্যাক্সমূলাররা নাসদীয়সূক্তমের অনুবাদ করছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে গিয়েছলেন। ম্যাক্সমূলার এক জায়গায় বলছেন – বেদের ঋষিরা যেন হিমালয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠছেন, একটার পর একটা চটিতে উঠেই চলেছেন, যেখানে সাধারণ মানুষের বাতাস নেই বলে বুক ফেটে যাবে, সেখানেও তাঁরা চলে গেছেন। তাঁদের বিবেক বুদ্ধিতে তীব্র সাধনার জোরে যেখানে চলে গেছেন সেখানে তাদের সমস্ত ভয় দূরীভূত হয়ে গেছে, কোন কিছু থেকেই তাঁর আর ভয় পাওয়ার নেই। মানে, যদি মনে করেন যে ব্যাপারটা অযৌক্তিক হয়ে যাচ্ছে, তখনও বলছেন – তাই হোক। কিন্তু তাঁর যে পরিষ্কৃত পবিত্র বুদ্ধি, সাধনা করে করে যে বুদ্ধিটা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে গেছে, সেই সাধনাকৃত বুদ্ধি তাঁকে ঐখানে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বলছি ভগবান থেকে অবিদ্যা কি করে জন্ম নিল, আমরা বলছি অসৎ থেকে সৎ কি করে আসছে? তাঁরা দেখছেন যে এইটাই হবে, এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পছন্দ নেই। ফিজিক্সে অনেক নিয়ম আছে যেখানে অনেক কিছুকে মনে হবে যে এই রকম হতেই পারে না, অথচ ঐটাই হয়।

তারপরে বলছেন - *প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।* ভগবানের সাথে অবিদ্যার কোন সংযোগ নেই অথচ বলছে সংযোগ আছে, এটাকে কি করে জানছেন? স্বামীজী বলছেন – Sages who have searched their hearts with wisdom, যখন ধ্যান করবে আট ঘন্টা, দশ ঘন্টা দশ বছর, কুড়ি বছর ধরে, ধ্যান করে করে মরে গেল, তারপরে আবার জন্ম নিল, জন্ম নিয়ে আবার চলতে লাগল সেই এক সাধনা, এই ভাবে করে করে – *বহুনাং জন্মনামান্তে,* মানে অনেক জন্ম সাধনা করে করে মন যখন পবিত্র হয়ে যাবে, হৃদয় একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তখন যখন প্রজ্ঞার আলোকটা হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় তখন এই জিনিষটাই পরিষ্কার হয়ে, স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। আধ্যাত্মিক সত্য এই পরিষ্কৃত শুদ্ধ হৃদয়েই উপলব্ধি হয়। এক জন্মে কিছুই হয় না, জঙ্গল পরিষ্কার করতে, হৃদয়ের আগাছা পরিষ্কার করতে করতেই অনেক জন্ম কেটে যায়। বেদের ঋষিরাও জানতেন যে আমি যে আধ্যাত্মিক সত্যকে দেখতে পারছি, এই সত্যকে সাধারণ মানুষকে কোন মতেই বোঝান যাবে না। গীতা, উপনিষদ, রামায়ণে বারে বারে একটা কথা

আমাদের জন্য বলা হয়েছে যে – বাপু, তুমি এটা বুঝতে পারবে না। কেনোপনিষদে আছে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, একটার পর একটা কথা বলে যাচ্ছেন, শিষ্য বিরক্ত হয়ে বলছেন – হে গুরুদেব, আপনি আমাকে উপনিষদের শিক্ষা দিন। গুরুও শিষ্যের প্রতি স্নেহ পরবশ হয়ে বলছেন – বোকা, আমি তখন থেকে তোমাকে উপনিষদই বুঝিয়ে যাচ্ছি।

আমরা এখানে ঋষিদের কথাই আলোচনা করছি। আমরা একেকটি কথাকে বোঝাবার জন্য কত রকমের উপমা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে করে একটা মন্ত্রের এ চতুর্থাংশও শেষ করতে পারছি না। এতো আলোচনার পরেও আমরা পুরোপুরি সংশয়মুক্ত হয়ে বুঝতে পারছি না। এই জিনিষটাকেই সাত-আট হাজার বছর ধরে ভারতের সব থেকে উচ্চ মস্তিষ্কের অধিকারী ঋষিরা সারাটা জীবন ধরে মুখস্ত করে গেছেন, চিন্তন করে গেছেন, বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করে গেছে, বিদেশী পণ্ডিতরা এই সব দার্শনিক তত্ত্ব দেখে হাত তুলে দিচ্ছেন। আর এই সব তত্ত্বকে আমরা বিশ্বাসই করতে পারছি না। সাধুরা যে কালে বলছে তাই মেনে নিচ্ছি। যদি এই তত্ত্বগুলিকে আমাদের নতুন করে আবিষ্কার করতে হত তাহলে, বিজ্ঞানেরও যে কোন তত্ত্বের যে আবিষ্কার হয়, যেমন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, আইনস্টাইনের Theory of Relativity বা Laws of Quantum, এই গুলো একদিনে আসেনি, অনেক দিন ধরে খাটতে খাটতে, সাধনা করতে করতে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা সত্য উদ্ভাসিত হতেই বুঝে গেল যে এটা থেকে এই হয়। বেদের এই তত্ত্ব গুলিও ঠিক তাই। এই তত্ত্বগুলি কাদের মধ্যে ধরা পড়ে? যে ঋষিদের হৃদয় একেবারে পরিষ্কার হয়ে নির্মল, স্বচ্ছ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বলছেন – *ইতি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা,* তাঁরা যখন নিজেদের প্রজ্ঞা, বুদ্ধিকে যখন প্রয়োগ করেন তখন তত্ত্বগুলিকে তাঁরা ধরতে পারেন। আমি আম গাছের তলায় মুখ হাঁ করে বসে আছি আর গাছ থেকে আমটা এসে আমার মুখে পড়বে, তা কখন হয় না।

প্রথমে চলে সাফাইয়ের কাজ, মনটাকে একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়, তারপর যুক্তি দিয়ে বিচার দিয়ে নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে বুদ্ধিকে ক্ষুরধার করা হয়। এই ক্ষুরধার বুদ্ধিকে এইবার প্রয়োগ করতে শুরু করবে, তখন একটা তত্ত্ব বেরিয়ে আসবে। কি তত্ত্ব? যেমন বলছেন সৎ আর অসৎ যুক্ত হয়ে আছে, সৎ এর জন্ম অসৎ থেকে, যা কিছু কার্য আছে তার কারণ হচ্ছে অব্যক্ত। এরপর আমরা বুঝি আর নাই বুঝি তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি বলে যদি ছেলে থাকে তাহলে তার মাকেও থাকতে হবে। মাও সন্তান তাই তারও একজন মা আছেন। এইভাবে বিচার করতে করতে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াবে আমরা ভাবতেই পারব না, কারণ আমাদের বুদ্ধি সেখানে গিয়ে পৌঁছাতেই পারবে না। এই যে আমরা এত বিস্তৃত ভাবে সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা করছি, সেখানে বলাই হচ্ছে যে এই জিনিষ গুলোকে তুমি ধারণাই করতে পারবে না, যখন দীর্ঘকাল ব্যাপি সাধনা করে করে তোমার হৃদয় পরিষ্কার হবে তখন বুঝতে পারবে। গীতার পঞ্চোদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – *উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ (১৫/১০)*।। মানুষ জাগ্রত অবস্থায় খাচ্ছে দাচ্ছে, কর্ম করছে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে, এই সমস্ত কিছুর পশ্চাতে যে আত্মা আছেন বলেই সব হচ্ছে, এটাকে বিমূঢ়া *নানুপশ্যন্তি,* মানে যারা বিমূঢ়, আমাদের মত সাধারণ লোকেরা এটা দেখতে পায় না। তবে কারা দেখতে পান? *পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুসঃ,* যাঁদের জ্ঞান চোখ খুলে গেছে তাঁরাই এটাকে দেখতে পান – এই শরীরে যা কিছু হচ্ছে, কিন্তু শরীর কিছুই না, ভেতরে যে আত্মা আছেন তিনিই সব, তিনি আছেন বলেই শরীর কাজ করতে পারছে। যতই বক্তৃতা শুনি, যতই শাস্ত্র অধ্যয়ণ করি কোন কিছুতেই হবে না, এগুলো হচ্ছে সাধনা সাপেক্ষ। সাধনা হচ্ছে হৃদয় মনকে পরিষ্কার করা।

মন পরিষ্কার দুই ধরণের লোকের হয়। এক ধরণের লোক হয় যারা অতি মুর্খ, মানে মুর্খতমের থেকেও মুর্খ যাদের বলা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসীরা চুরি করা, মিথ্যা কথা কখন বলে না। গ্রামের লোকেদের মত সৎ লোক পাওয়া যাবে না, ওরা জানেই না চুরি করা কাকে বলে, মিথ্যা কথা কাকে বলে। খুব সহজ সরল হয়, তাই এদের মনটাও খুব পরিষ্কার। কিন্তু এদের জীবনচর্চার গতি ঐখানেই থেমে থাকে,

তাই তাদের দ্বারা কিছু হয়ও না। আরেক ধরণের লোক হচ্ছেন উচ্চতম ঋষি যাঁরা, এঁদের মনটা সব সময় খুব পরিষ্কার। এই দুই ধরণের লোকের মাঝখানে যারা আছে, আমাদের মত যারা, এরা সবাই গোলমেলে। কিছু হলেই বলবে – আপনি কি আমায় মিথ্যেবাদী বলে মনে করেন? মিথ্যেবাদী বলার অপেক্ষা কোথায়, মিথ্যেবাদী তো আছই। প্রত্যেকটি মানুষ হচ্ছে একজন potential criminal, কিছু মানুষ হচ্ছে যারা পুলিশ, সমাজের ভয়ে করতে পারে না, কিছু লোক পরিবারের ভয়ে করে না, আর বেশির ভাগ লোক সুযোগ পায় না বলে করে না। যারা রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে রয়েছে তারা এখন চেঁচাচ্ছে। কিসের জন্যে? সত্তা চাই। সত্তা যখন পেয়ে যাবে তখন এখন সত্তাধারীরা যা করছে তারাও ঐটাই করবে। আমি এখন সৎ কারণ আমি চুরি করার সুযোগ পাচ্ছি না। কেউ যদি এই কথা শুনে বলে – আপনি কি আমাকে চোর মনে করছেন? চোর মনে করব কি, আসলে তুমি তো বাপু একজন potential ডাকাত। আর এই গ্রামের যে সব লোকেদের কথা বলা হল, এরাও একেক জন potential ডাকাত, ওদের এখনও বুদ্ধি জাগ্রতই হয়নি ডাকাতি করার।

ঠাকুর বলছেন – যে নাচতে যানে তার কখন বেতালা পা পড়ে না, তাকে ঘুম থেকে তুলে দিয় নাচাতে শুরু করলেও বেতালা পা পড়বে না। কেউ যদি ঠাকুর, স্বামীজীর মত মানুষকে দিয়ে কোন ভুল কাজ করাতে যান, ওনারা চেষ্টা করেও ভুল কাজ করতে পারবেন না। খুব সহজ উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। আমরা হলাম চরিত্রবান পুরুষ, অপরের মেয়ের দিকে, পরস্ত্রীর দিকে বা পর পুরুষের দিকে নজর দিই না। আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সেই সুযোগই নেই নজর দেব কি করে, আমাদের সেই পরীক্ষাই এখনও হয়নি। মথুর বাবু ঠাকুরকে নর্তকীর বাড়িতে নিয়ে গেছে, ঘরে ঢুকেই ঠাকুর 'মা' 'মা' বলে সমাধিস্ত হয়ে গেলেন, এইটাই হচ্ছে চরিত্র। মানে, ঠাকুর যদি খারাপ কিছু করতেও চাইতেন পারতেন না। ঠাকুরের উপমাতেই বলতে হয় – পরশমণির ছোঁয়া লেগে তলোয়ার সোনা হয়ে গেছে, সেই তলোয়ার দিয়ে আর হিংসার কাজ হবে না। যতক্ষণ না আমাদের সেই পরশমণির স্পর্শ না হয়ে থাকে ততক্ষণ আমরা প্রত্যেকেই, সেই তথাকথিত মহাপুরুষ থেকে শুরু করে একেবারে সামান্য কুলি মজুর পর্যন্ত সবাই সমান, কেউ ঊনিশ আর কেউ সোয়া ঊনিশ। এইটাই কিন্তু ঘটনা। এখন যে মন হচ্ছে একটা potential criminal, একটা potential fraud, যে মন আগাছা আর জঙ্গলে ভর্তি হয়ে আছে, সেই মন দিয়ে কি আর সৎ আর অসৎ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত, অসৎ থেকে সৎ এর জন্ম হচ্ছে বুঝতে পারবে না ধারণা করতে পারবে। এই তত্ত্বগুলিকে আবিষ্কার করা দূরে থাক, বোঝা বা ধারণা করাই অসম্ভব। এই জিনিষ গুলিকে কারা বুঝবে? যাদের মন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে তারাই বুঝতে পারেন যে সৎ আর অসৎ হচ্ছে বন্ধু, বন্ধু মানে এই দুটো আলাদা কিছু নয়।

হৃদি প্রতীষ্য মানে হৃদয়ে জানতে পারে। বাইরে কিছু দেখে তার মনে হচ্ছে তা নয়, যেমন আমরা এই বোতলটা দেখতে পাচ্ছি, মাইক্রোফোনটাকে দেখতে পাচ্ছি, এখানে বাইরে থেকে কিছু হচ্ছে না। এই ধরণের সমস্ত জ্ঞান ভেতরে নিজের মনের মধ্যেই পরিষ্কার জাগ্রত হয়। যখন আইনস্টাইন $E = MC^2$ দেখছেন, তিনি কোথায় দেখছেন? আসলে এনারা সবাই এই সত্য গুলিকে মনের মধ্যেই দেখেন। $E = MC^2$ যেটা দেখেছেন সেটা বাইরে অঙ্কের মাধ্যমে কষে কষে বার করেছেন, কিন্তু এর পেছনে বিজ্ঞানের যে সত্যটা রয়েছে, সেটাকে তিনি মনের মধ্যে দেখেছেন। তখন থেকে যে আমরা সৎ অসতের কথা বলে আসছি, এই দুটোর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে একটা সম্পর্ক রয়েছে, এই সত্যটাকেই শুদ্ধ মন আর পবিত্র হৃদয়ের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। এই সত্যই উত্তরকালে একই ধরণের শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী পুরুষের দ্বারা যাচাই হয়ে যায়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ শুধু শ্রবণ করে যাব, ধারণা করা বা উপলব্ধি করা যাবে তখনই যখন আমাদের মনও ঐ রকম শুদ্ধ ও পবিত্র হবে।

পঞ্চম মন্ত্রে বলছেন – ***তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ। রেতোধা আসন্মহিমান আসন্নৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।।*** সৃষ্টিটা কিভাবে হল বলতে গিয়ে বলছেন যখন কাম এল

তখন সৃষ্টি হতে শুরু করেছে, সৃষ্টি যখন শুরু হয়ে গেল তখন পুরো জিনিষটাকে যেন প্রসারিত করে দিল। জিনিষটা যেটা ছোট ছিল সেটা এখন বাড়তে শুরু করেছে। প্রথমে বলেছিল কিছুই নেই, কেননা অসৎ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে, এবার প্রথম আলো যেন বিকশিত হয়ে প্রথম যেন সৃষ্টি এগোতে শুরু করল। এই আলোটাকে ওনারা বলছেন রশ্মি। রশ্মি কথার অর্থ হতে পারে আলো বা কিরণ অথবা দড়ি। মনে করা যাক একটা ঘরে অনেক লোকজন এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। এখন এই ঘরটাকে একটা ছোট করতে করতে একটা পয়েন্ট সাইজে করে দেওয়া হল। ধরা যাক এই পয়েন্ট সাইজটা রাবারের দড়ির মত। এখন কোন সৃষ্টি কর্তা এলেন। তিনি এই পয়েন্ট সাইজের রাবারটাকে টানতে শুরু করলেন। যখন টানতে শুরু করলেন, ঐ পয়েন্ট সাইজটাও আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে তার আগের স্বাভাবিক আকারে ফিরে এল। এর বিস্তারটা চারিদিকে হতে থাকে। ওপর নীচে, ডান দিক থেকে বাম দিকে, মানে আড়াআড়ি আবার লম্বালম্বি ভাবে চারিদিকে বিস্তার হতে থাকে। তিনটে দিকেই যে একসাথে টানতে শুরু করেছে, নীচের দিকে, উপরের দিকে আর আড়াআড়ি। *রেতোধা আসন্মহিমান* – এখানে বলতে চাইছে যখন সৃষ্টি হল তার কিছু কিছু ছিল সাধারণ আর কিছু কিছু ছিল মহিমা যুক্ত মানে powerful। আমরা মনে করছি সৃষ্টিতে সব সমান, ভক্তদের মাঝে কেউ ছোট নয় কেউ বড় নয় সবাই সমান, আসলে কিন্তু তা নয়। *আসন্‌ৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ* - এখানেই বলা হচ্ছে যে উঁচু নীচু প্রভেদ প্রথম থেকেই করা হয়েছে। নরেন রাখাল এনারা চিরদিনই আলাদা। ধনী-দরিদ্র চিরকালই আছে, কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনে মাঝে মাঝে ধনী দরিদ্র হয় আর দরিদ্র ধনী হয়, কিন্তু অসাম্য চিরকালই থাকবে। বেদের মতেই বলছে – inequality is the law of life, যেটা খাদ্য সে হচ্ছে ছোট আর যে খাচ্ছে সে হচ্ছে বড়। গাধা যেমন মানুষের বোঝা বহন করে ঠিক তেমনি এই মানুষরাও দেবতাদের বোঝা বহন করে চলেছে। আর আমরা বড়লোকেদের বোঝা বহন করি।

যখন বিগব্যাঙ থিয়োরি আবিষ্কার হয়েছিল তখন আমেরিকায় একটা খেলনা বেরিয়েছিল, যার নাম ছিল Ultimate Plastic, তার মধ্যে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের কিউব্ থাকত যেটাকে টানা যেত। পুরোটাই সলিড প্লাস্টিক, ঐ কিউবের মধ্যে ছোট ছোট বল এমন ভাবে থাকত, টানা হলেও বল গুলির সাইজ পাল্টাত না। বাচ্চাদের বলা হত দুই দিকে দড়ি লাগিয়ে এই কিউবটাকে টানতে থাক। যখন টানা শুরু হত তখন এই ছোট্ট কিউবটা তিন দিকে বাড়তে বাড়তে পুরো ঘরের সাইজের হয়ে যেত। Galaxy গুলোকে দেখানোর জন্য বল গুলো রাখা থাকত।

মডার্ন ফিজিক্সে space এর যে ধারণা করা হয়, এখানে বলতে চাইছেন যে সেই space টাকে যেন সৃষ্টি শুরু হতেই যেন প্রসারিত করে দেওয়া হল। আর এই space এখনও প্রসারিত হয়ে বেড়েই চলেছে। কিভাবে হচ্ছে? জড় আছে আর প্রাণ রয়েছে, প্রাণ এই জড়ের উপরে হাতুরির মত আঘাত করে যাচ্ছে, আগে যেমন বলা হয়েছিল *আনীদবাতং*, এখানেও ঠিক ঐ রকম বলা হচ্ছে। Space, matter যা কিছু আছে তার উপর আঘাত হয়েই চলেছে আর একটার পর একটা সৃষ্টি হয়েই চলেছে।

সৃষ্টি যখন হতে শুরু করল, তখন দুই ধরণের সৃষ্টি হতে থাকল – force and matter and enjoyer and enjoyed, মানে যিনি enjoy করবেন আর যেটাকে enjoy করা হবে, এই দুটোই সৃষ্টি হল। এর মধ্যে যে জিনিষটা enjoy করা হবে সে হচ্ছে inferior আর যে enjoy করবে সে হচ্ছে superior। যেমন খাওয়া, মানুষ আর খাওয়া, মানুষ হচ্ছে উৎকৃষ্ট আর খাওয়াটা হচ্ছে নিকৃষ্ট। এখানে ভাষ্যকারদের বক্তব্য হচ্ছে – যখন সৃষ্টি হতে শুরু হয়েছে তখন প্রথমে এসেছে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, এইভাবে একটার পর একটা, অগ্নি, পৃথিবী ও জল সৃষ্ট হয়েছে। এইগুলো সৃষ্টি হওয়ার পরেই জড় পদার্থ সকল আর জীব সকলের জন্ম হল। কিন্তু সৃষ্টি যখন হতে শুরু করল তখন পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত গতিতে সৃষ্টি হতে লাগলো যেন চোখের পলক পড়তে যত সময় লাগে তার থেকেও দ্রুততার সাথে তৈরী হয়েছে, তাই এটা বলা মুশকিল যে আকাশ থেকে বায়ুর সৃষ্টি হল না বায়ু থেকে আকাশের সৃষ্টি হল। তবে পরের দিকে যুক্তির দিক দিয়ে দেখার সময় বোঝা যাচ্ছে যে বায়ু থেকে আকাশের ব্যাপারটা যুক্তি বিচারে

দাঁড়াচ্ছে না। ফিজিক্সেও বলছে বিগব্যাঙ যখন বিস্ফোরণ হয় তখন এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি হয় বোঝাই যায় না। সেই সময়ের তাপমান যে অবস্থাতে চলে যায় সেটা আমরা কল্পনাই করতে পারিনা। এখানে কিন্তু ঋষিরা বলে দিচ্ছেন কোনটার পর কোনটা সৃষ্টি হয়ে হয়ে শেষে matter and light এই দুটো বেরিয়ে এল। যেটাই যেটার পরে আসুক না কেন, এনারা বলছেন পুরো ব্যাপারটাই এক নিমেষের মধ্যে সৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসছে। সেগুন গাছ লাগান হল, তারপর কবে যে বড় হবে, আর কবে যে তার কাঠ থেকে আসবাব তৈরী হবে আমরা জানিনা, এখানে সৃষ্টি কিন্তু সেই ভাবে হচ্ছে না। নিমেষের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে, একটার পর একটা যেন সাজান ছিল আর আঘাত করতেই দুম্ করে বেরিয়ে আসছে। কে আঘাত করছে? শক্তি বা প্রাণ যাই বলা হোক না কেন, সেই আঘাত করে যাচ্ছে।

এখন পরের মন্ত্রে এসে আবার অন্য ধরণের কথা বলছেন। এতক্ষণ সৎ অসতের কথা, *আনীদবাতং* energy matter এর উপর আঘাত করছে, এগুলো ঋষিরা পবিত্র হৃদয়ে জানতে পারেন। এত কথা বলার ষষ্ঠ মন্ত্রে বলছেন – ***কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্‌দবা অস্য বিসর্জনেনাহথা কো বেদ যত আবভূব।।*** এই যে এত কিছু বলা হল এগুলো কে জানে, আর কেই বা বলবে? যিনি বলছেন সেতো দূরের কথা, আদপে এগুলো কেউ জানে কিনা সেটাই কেউ বলতে পারছে না। যেমন আমরা অনেক সময় অনেক কিছু জানি কিন্তু বলতে পারিনা। কিন্তু এখানে বলছেন – বলা তো দূরের কথা, এটা কেউ জানেও কিনা সন্দেহ হয়। এই সমস্ত কিছু কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে এদের সৃষ্টি হল এই কথা কে বলবে? মানুষের কথা ছেড়ে দাও, এই যে দেবতারা আছেন, তাদেরও জন্ম সৃষ্টির অনেক পরে। সেইজন্য কে জানে এই সৃষ্টি কোথা থেকে শুরু হয়েছে আর কিভাবে শুরু হয়েছে। একেই বলে সততা, ঋষিরাও স্বীকার করে দিচ্ছেন। একটা অবস্থার পর আর ধরা যায় না, নাসাদীয়সূক্তম্ নিজেই বলে দিচ্ছে যারা খুব নিশ্চিত হয় দৃঢ়তার সাথে যুক্তি দিয়ে সৃষ্টির সম্বন্ধে সব কথা বলে দেন, তাদেরকে বলছেন –বেদের ঋষি, উপনিষদের ঋষিরা কি সত্যিই জানেন জিনিষটা? চতুর্থ মন্ত্রে বলেছিলেন – সেই সব ঋষিরা যখন হৃদয়ের পবিত্রতার পরাকাষ্ঠায় চলে গিয়ে নিজেদের প্রজ্ঞাকে সেখানে লাগিয়েছেন তখন তাঁরা কিছু জিনিষকে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু প্রমাণ কোথায় তাঁরা যেটা জেনেছিলেন সেটাই ঠিক? কোন ভাবে প্রমাণ করা যাবে না। সেইজন্য বলছেন *কঃ অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ* - কে সত্যিই জানেন আর কে সত্যি সত্যিই বলতে পারবেন? নরেন্দ্রনাথ সবাইকে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছেন – মশাই আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? কে দেখেছে, আর কেউ বা বলবে আমি দেখেছি। তারপরে বলছে *কুত আজাতা* – কোথা থেকে এর জন্ম হয়েছে, কোথায় তৈরী হয়েছে এই সৃষ্টি। দেবতারাও কি জানতে পারেন? এখানে যে দেবতাদের কথা বলা হচ্ছে, যে অর্থে আমরা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্রদের জানি, এখানে সেইভাবে দেবতার কথা বলা হচ্ছে না। যখন যজ্ঞ হত, তখন যজ্ঞে যেসব আহুতি দিতেন, সেই আহুতি যাঁদের উদ্দেশ্যে করা হত, ঋষিদের কাছে সেই সব দেবতারা হলেন শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। তাই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ দেবতারা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম শক্তি। ঋষিরা বলছেন, আমাদের কথা তো বাদ দাও, সেই শ্রেষ্ঠতম দেবতাদের জন্মও সৃষ্টির অনেক পরে। এখানে আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে পেলাম। আমরা যখন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণাদি দেবতাদের কথা বলি, তখন এই দেবতাদের পূজা ঋষিরাও করতেন। কিন্তু ঋষিরা জানতেন যে এই সব দেবতারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন না। দেবতারা সৃষ্টি কর্তা নন, এনারা হচ্ছেন প্রকৃতির দেবতা, মানে দেবতাদের শুধু প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া ছিল। সেইজন্য এখানে বলছেন *অর্বাগদেবা অস্য বিসর্জনেনাহথা* – মানে এই দেবতাদের সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। আমরা এদের পূজো করি, প্রার্থনাও করছি আমাদের ভালো ভাবে দেখাশুনা করার জন্য, কিন্তু আমরা এটাও ভালো করে জানি যে এই দেবতাদের জন্ম অনেক পরে হয়েছে। যে জন্মের সময়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই একমাত্র বলতে পারবে সৃষ্টির সময় কি হয়েছিল। কিন্তু কেউই তো সেই সময় ছিল না।

সৃষ্টির ব্যাপারে ঋষিদের এইটাই কিন্তু শেষ কথা নয়, তারপর তাঁরা যখন তাঁদের পবিত্র হৃদয়ে তাঁদের প্রজ্ঞাকে লাগিয়েছেন তখন তাঁরা সৃষ্টির তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এখন সত্যিই বোঝা

যায় এর পরে সৃষ্টির ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে আর কিছু বলা যায় না। বিজ্ঞানীরা ফিজিক্সের থিয়োরি প্রয়োগ করে আজকে যে dark matter, dark light বলছে সেটাকে তারা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে না, অনুমানের মাধ্যমে বলছে। Dark matter মানে যেটাকে আমরা verify করতে পারিনা। বলা হচ্ছে যে dark matter নাকি অনবরত আমাদের শরীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, আর এই পৃথিবীর যা ওজন তার ঊনিশ গুণ বেশি ওজন এই পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। এই পৃথিবী যখন সূর্যের চার পাশে প্রদক্ষিণ করছে তখন নাকি এই পৃথিবী এই dark matter আর dark energyর সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আমরা যা কিছু এখন দেখতে পাচ্ছি তার ওজন, সমস্ত dark matter এর মোট ওজনের মাত্র একশ ভাগের পাঁচ ভাগ। বাকী ৯৫% পদার্থের কোন খবর বিজ্ঞান জানেই না। আমার আপনার মাঝখানে যদি একটা vacuum করে দেওয়া হয়, তাহলে কি ঐ জায়গাটা খালি পড়ে আছে? না, আমার আপনার যে মোট ওজন তার কুড়ি গুণ বেশি ওজনের dark matter দিয়ে ঐ জায়গাটা ভরে আছে। বিজ্ঞানীরা একেবারে হিসেবে করে দেখেছেন, যদি এই রকম না হয় তাহলে হিসেব মিলবে না।

এই যে এত dark matter আর dark light এর কথা বলছে বিজ্ঞান, তারাও বলছেন এগুলো আমরা সরাসরি জানতে পারছি না, এগুলো আমরা indirect পদ্ধতিতে জানতে পারছি। আমরা যে এখানে সৃষ্টির কথা আলোচনা করছি, আমরাও বলছি এই যে সৃষ্টিটা আমাদের indirectly method এ জানতে হবে। কি সেই indirect method? যে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে শুদ্ধ পবিত্র মনটাকে এই সৃষ্টির রহস্যে লাগালেন তখন তাঁরা এই সৃষ্টির রহস্যটাকে বুঝতে পেরেছিলেন।

শেষ মন্ত্রে বলছেন – ***ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা না। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।।*** বলছেন – যিনি এই সৃষ্টির জন্মদাতা তিনিই হয়তো এই সৃষ্টির রহস্যকে জানেন, কারণ তিনিই জন্ম দিয়েছেন। মা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, মা জানে কবে সন্তানের জন্ম হয়েছে, সন্তানের জানার কোন পথই নেই। আর সন্তানের সন্তান সে কি কখন জানতে পারে তার বাবার বাবার জন্ম কিভাবে হয়েছিল। তাই বলা হচ্ছে যার থেকে এই সৃষ্টি তিনিই এই সৃষ্টি রহস্যকে বুঝতে পারবেন। অথবা *সঃ অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ* - মানে, যিনি স্রষ্টা তিনিও হয়তো এই সৃষ্টির রহস্যকে জানেন না। এই লাইনটার আবার অন্য ব্যাখ্যা হচ্ছে – একমাত্র তিনিই জানেন, *ন বেদ* কথার অর্থ তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। নাসাদীয়সূক্তম্ একটা কবিতা, কবিতার একটা সমস্যা হয় কি, এতে কিছু কিছু শব্দ উহ্য থাকে বলে এর অর্থ পাঁচ ভাবে করে দেওয়া যায়।

আলোচনা করে করে আমরা এখানে এসে সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছি। সৎ অসতের আলোচনা করে প্রথমে দেখলাম এগুলো ঋষিরা পবিত্র হৃদয়ে দেখতে পান। দ্বিতীয় ধাপে বললেন কে জানতে পারবে এই সৃষ্টির কথা? কারণ আমাদের দৃষ্টিতে যারা সবচাইতে বুদ্ধিমান, সেই দেবতাদেরও সেই সময় জন্ম হয়নি। এবারে তৃতীয় ধাপে এসে আরও জটিলতা তৈরী করে বলছেন – যিনি স্রষ্টা, যিনি অধ্যক্ষ *অস্যাধ্যক্ষঃ* এই সব কিছুর, হয় তিনি এটার রহস্য জানেন বা হয়তো তিনিও জানেন, অথবা একমাত্র তিনিই জানতে পারেন। স্বামীজী এটার অনুবাদ করেছেন – He knows, সৃষ্টি প্রকরণের শেষ কথা হচ্ছে ভগবান নিজেও জানেন কিনা সৃষ্টিটা কিভাবে হয়েছে বা আদপে কোন সৃষ্টি হয়েছে কিনা, বলা যায় না। এইটাই হচ্ছে বেদের মত। এটার আরেকটা ব্যাখ্যা হচ্ছে – যদি সৃষ্টির ব্যাপারে আদপে কিছু জানেন তা একমাত্র তিনিই জানেন, তাছাড়া আর কারুর পক্ষে জানা অসম্ভব। আমরা জানি যে বেদে ঈশ্বরের কোন কথা নেই। কিন্তু এই শেষ সপ্তম মন্ত্রে যে বলা হচ্ছে *যো অস্যাধ্যক্ষঃ*, যিনি এই সৃষ্টির অধ্যক্ষ, এই উক্তিতে কিন্তু আমরা সেই পরম সত্তার কথা বেদে পাচ্ছি, ঈশ্বর এই নাম না ব্যবহার করেও ঈশ্বরকে বেদ স্বীকার করে নিচ্ছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বেদের ঋষিরা ভগবান মানতেন না, এই মতটা যে কত ভ্রান্ত ধারণা প্রসুত এইখানে এসে তার প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। ভগবান যিনি, তাঁকে সব সময় অধ্যক্ষ রূপে দেখা হয়। অধ্যক্ষ কি রকম – যেমন আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী আছেন, রাষ্ট্রপতি আছেন, অন্যান্য বড় বড়

প্রশাসকরা আছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন সর্বেসর্বা, তিনি হচ্ছেন অধ্যক্ষ। রাষ্ট্রপতি আছেন বলেই বাকী সবাই কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী আছেন, তার নীচে আরও আরও অফিসার আছে, তারপর জেলা শাসক, বিডিওরা আছেন। তারা সবাই নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রধান, কিন্তু রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন সবার উপরে, তিনিই হলেন সবার অধ্যক্ষ। তাই আমাদের যে ছোট ছোট নানা সমস্যা আছে সেগুলোর জন্য আমাদের রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়ার দরকার পড়ে না, ছোট ছোট অফিসারদের কাছে গেলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। বেদের ঋষিদেরও ঠিক এই ভাবনাটা কাজ করত। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র যত দেবতা আছেন, এছাড়াও আরও ছোট ছোট দেবতারা আছেন, তাদের দ্বারাই ওনাদের কাজ হয়ে যেত, তাই ওনারা অধ্যক্ষের কাছে কোন কিছুর জন্য আবদার করার প্রয়োজন অনুভব করতেন না। কিন্তু যেই উপনিষদে চলে আসব বা বিশেষ করে যখন গীতাতে ঢুকে পড়ব তখন দেখব যে সেখানে এই সব ছোট খাটো দেবতাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলছে ঈশ্বরই আমার সব কিছু করে দেবেন, এইসব ছোট ছোট দেবতাদের কাছে যাবার আমার কি দরকার। বৈদিক যুগ থেকে পরবর্তি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাই একটা বিরাট রূপান্তর। বৈদিক যুগের ধারণা ছিল যে দেবতাদের দ্বারাই যখন আমার সব কাজ হয়ে যাচ্ছে তখন ভগবানকে কেন বিরক্ত করতে যাব। পরের দিকে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গিতে এইটাই ঘুরে গিয়ে দেবতাদের গুরুত্ব কমে গেল কারণ তাদের মনে হল যে স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে যদি আমার সব কিছুর প্রয়োজন মিটে যায় তাহলে কেন আমি এই ছোট ছোট দেবতাদের কাছে ছুটে যাব।

নাসদীয়সূক্তমে উত্তরকালের প্রথম দর্শন সাংখ্যের বীজ প্রসুপ্ত ছিল। কেননা সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টি তত্ত্ব নাসদীয়সূক্তমের তত্ত্বকেই অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। সাংখ্যে এই তত্ত্বটা আছে বলে যোগদর্শনেও নাসদীয়সূক্তমের এই তত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেখান থেকে বেদান্ত দর্শনও নাসদীয়সূক্তমের সৃষ্টি তত্ত্বের এই ভাবটাকেই গ্রহণ করেছে, মানে শক্তি বা প্রকৃতি জড়ের উপর কার্য করে। তাই প্রথম হচ্ছে প্রকৃতি তারপর সেখান থেকে বিবর্ত হতে থাকে। কিন্তু পুরুষসূক্তমের সৃষ্টি তত্ত্বে ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। নাসদীয়সূক্তমে প্রাণই যেন সব সৃষ্টি করছে কিন্তু পুরুষসূক্তমে ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা, আর তিনি নিজেকেই সব কিছুতে প্রবিষ্ট করেছেন। নাসদীয়সূক্তমের যেটা আসল সৌন্দর্য, তা হচ্ছে সত্যিকারের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সৃষ্টি তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একজন সত্যিকারের দার্শনিক, চিন্তাবীদ যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে সৃষ্টিকে দেখেন নাসাদীয়সূক্তম্‌ও ঠিক সেইভাবেই সৃষ্টিকে দেখেছেন। আবার একজন ভক্ত সৃষ্টিকে কিভাবে দেখবে তার দৃষ্টিকোণ দিয়ে পুরুষসূক্তম্‌ এই সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেছে।